ষষ্ঠ অধ্যায়

# সাহিত্য পড়ি সাহিত্য লিখি

## ১ম পরিচ্ছেদ

## কবিতা

### ৬.১.১ কবিতা লিখি

কবিতা রচিত হয় কোনো একটি বিষয় বা ভাবকে কেন্দ্র করে। কবিতা তাল দিয়ে পড়া যায়। তাছাড়া কবিতায় মিলশব্দ থাকে। এখন তোমার জীবনের বা সমাজের কোনো ঘটনা বা প্রসঙ্গ কিংবা মনের কোনো ভাব বা অনুভূতি নিয়ে আলাদা কাগজে একটি কবিতা রচনা করো। Answer on next page

তোমার লেখা কবিতা থেকে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে দেখো—

- কোনো বিষয় বা ভাবকে অবলম্বন করে রচিত কি না
- লাইনগুলো সমান দৈর্ঘ্যের কি না
- লাইনের শেষে মিলশব্দ আছে কি না
- তাল দিয়ে দিয়ে পড়া যায় কি না

### কবিতা কী

কবিতায় প্রতিফলিত হয় কবির আবেগ, অনুভূতি। কবিতার লাইনকে বলা হয় চরণ। কবিতার সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

- কবিতায় লাইন বা চরণের শেষে মিলশব্দ থাকে।
- কবিতায় শব্দের রূপ বদলে যেতে পারে।
- কবিতা তালে তালে পড়া যায়।

কবিতার এসব বৈশিষ্ট্যের কথা তোমরা আগে জেনেছ। এর বাইরেও কবিতার আরো কিছু বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।

ক. কবিতায় স্তবক থাকতে পারে। কবিতার অনুচ্ছেদকে বলে স্তবক। স্তবক তৈরি হয় সাধারণত একাধিক লাইন বা চরণের সমন্বয়ে।

খ. সব কবিতা সমান গতিতে পড়া হয় না। কোনো কোনো কবিতার গতি থাকে বেশি, কোনোটি মাঝারি গতির হয়, আবার কোনো কোনো কবিতার গতি হয় কম। এই গতির নাম লয়।

গ. কবিতায় উপমা থাকে। উপমা হলো এক ধরনের তুলনা। কোনো বিবরণকে আকর্ষণীয় করে তুলতে কবিতায় উপমার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন, ‘নোলক’ কবিতায় পড়েছিলে, ‘এলিয়ে খোঁপা রাত্রি এলেন, ফের বাড়ালাম পা’। এখানে রাতের অন্ধকারকে খোঁপার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

কবিতার একটি ধরনের নাম ছড়া। ছড়ায় চরণের শেষে মিল থাকে, চরণগুলো প্রায় ক্ষেত্রে সমান দৈর্ঘ্যের হয়, অল্প ব্যবধানে তাল পড়ে এবং পড়ার গতি বা লয় দ্রুত হয়।

পদ্মানদীর বাঁকে বাঁকে থোকা থোকা গাঁও
দেখে যেন মনে লাগে পালতোলা সব নাও।
ফুর ফুরিয়ে ঘুর ঘুরিয়ে বেশতো পালের নাচ
ভুল হয়ে যায় দৃশ্যগুলো লম্বা তালের গাছ।

চিক চিকিয়ে ফিক ফিকিয়ে ধরায় চোখে ধাঁধা
পাড়গুলো ঠিক চোখে পড়ে বালি দিয়ে বাঁধা।
লাফ লাফিয়ে ছল ছলিয়ে দুলছে ঢেউয়ের জল
ভুল হয়ে যায় দৃশ্যগুলো দুষ্টু ছেলের দল।

আমার লেখা কবিতা থেকে বৈশিষ্টগুলো-

- আমার লেখা কবিতাটির বিষয়বস্তু পদ্মাপাড়ের গ্রাম এবং ভাব হলো স্মৃতিচারণা।
- আমার কবিতাটির লাইনগুলো সমান দৈর্ঘ্যের।
- কবিতার লাইনের শেষে মিলশব্দ আছে।
- কবিতাটি তাল দিয়ে পড়া যায়।

## কবিতা পড়ি ১

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) বাংলাদেশের একজন প্রধান কবি। নাগরিক জীবন, মুক্তিযুদ্ধ, গণ-আন্দোলন ইত্যাদি তাঁর কবিতার বিষয়। 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', 'রৌদ্র করোটিতে', 'বন্দি শিবির থেকে' ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত কবিতার বই। শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা কবিতার বইয়ের মধ্যে আছে 'এলাটিং রেলাটিং', 'ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো' ইত্যাদি। নিচের 'পণ্ডশ্রম' কবিতাটি শামসুর রাহমানের 'ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

# পণ্ডশ্রম

### শামসুর রাহমান

এই নিয়েছে ওই নিল যা
কান নিয়েছে চিলে।
চিলের পিছে ঘুরছি মরে
আমরা সবাই মিলে।

দিনদুপুরে জ্যান্ত আহা,
কানটা গেল উড়ে।
কান না পেলে চার দেয়ালে
মরব মাথা খুঁড়ে।

কান গেলে আর মুখের পাড়ায়
থাকল কী-হে বলো?
কানের শোকে আজকে সবাই
মিটিং করি চলো।

যাচ্ছে, গেল সবই গেল,
জাত মেরেছে চিলে।
পাজি চিলের ভূত ছাড়াব
লাথি, জুতো, কিলে।
সুধী সমাজ! শুনুন বলি,
এই রেখেছি বাজি,
যে জন সাধের কান নিয়েছে
জান নেব তার আজই।

মিটিং হলো ফিটিং হলো,
কান মেলে না তবু।
ডানে-বাঁয়ে ছুটে বেড়াই
মেলান যদি প্রভু।
ছুটতে দেখে ছোট্টো ছেলে
বলল, ‘কেন মিছে
কানের খোঁজে মরছ ঘুরে
সোনার চিলের পিছে?’

'নেইকো খালে, নেইকো বিলে
নেইকো মাঠে গাছে;
কান যেখানে ছিল আগে
সেখানটাতেই আছে।'

ঠিক বলেছে, চিল তবে কি
নয়কো কানের যম?
বৃথাই মাথার ঘাম ফেলেছি,
পণ্ড হলো শ্রম।

## শব্দের অর্থ

**জ্যান্ত:** জীবন্ত।

**দিনদুপুরে:** প্রকাশ্যে।

**পণ্ডশ্রম:** ব্যর্থ পরিশ্রম।

**ফিটিং:** মিটিংয়ের সাথে মেলানো অনুকার শব্দ।

**বৃথা:** অকারণ।

**মাথা খোঁড়া:** মাথা ঠোকা।

**মাথার ঘাম ফেলা:** পরিশ্রম করা।

**মিছে:** মিথ্যা।

**মিটিং:** সভা।

**মুখের পাড়া:** মুখমণ্ডল।

**যম:** মৃত্যুর দূত।

**সুধী সমাজ:** জ্ঞানীজন।

## ৬.১.২ কবিতার গঠন বুঝি

'পণ্ডশ্রম' কবিতায় অন্ত্যমিল আছে কি না, তাল দিয়ে পড়া যায় কি না, শব্দরূপের পরিবর্তন ঘটেছে কি না, কোনো স্তবক আছে কি না, পড়ার গতি বা লয় কেমন, এবং উপমার প্রয়োগ হয়েছে কি না—এসব নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো। answer see on next page

## ৬.১.৩ জীবনের সাথে কবিতার সম্পর্ক খুঁজি

'পণ্ডশ্রম' কবিতার আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

- পঞ্চশ্রম' কবিতায় প্রতি স্তবকের দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনের শেষে অন্ত্যমিল আছে। যেমন: বলো-চলো, চিলে-কিলে।
- কবিতাটি তালে তালে পড়া যায়। যেমন:

  এই নিয়েছে/ওই নিল যা
  কান নিয়েছে/চিলে।
  চিলের পিছে/মরছি ঘুরে/
  আমরা সবাই/মিলে।

- কবিতায় স্তবক আছে।
- কবিতাটির লয় বা গতি দ্রুত।
- কবিতাটিতে কিছু শব্দরূপের পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন: নেই-নেইকো, সেখানেই-সেখানটাতেই, নয়-নয়কো।
- 'সোনার চিলের পিছে' কবিতার এই লাইনটিতে উপমার প্রয়োগ করা হয়েছে।

১। ‘পণ্ডশ্রম’ কবিতায় কীভাবে শ্রম পণ্ড হলো?

উত্তর: ‘পণ্ডশ্রম’ কবিতায় চিলে কান নেওয়ার গুজব শুনে লোকেরা সত্যতা যাচাই না করেই চিলের পেছনে ছুটতে শুরু করে। কান হারানোর গুজবে সবাই হা-হুতাশ করে, মিটিং করে। পাজি চিলকে মারার ফন্দি করে। কানের খোঁজে চারদিকে ছুটে বেড়ায়, কান সত্যিই চিলে নিয়েছে কি না তার সত্যতা যাচাই না করেই। এমতাবস্থায় একটি ছোট্ট ছেলে সবার ভুল ভাঙ্গিয়ে দেয় এই বলে যে, কান কানের জায়গাতেই আছে; বরং মানুষ মিছেই ঘুরে মরছে। ছেলেটির কথায় সকলের হুঁশ ফেরে। তারা অনুভব করে গুজব শুনে চিলকে কানের যম ভেবে তারা যে পরিশ্রম করেছিল তা সবই বৃথা।

২। তথ্য যাচাই না করে কাজ করলে তার ফলাফল কী ধরনের হতে পারে বলে তুমি মনে করো?

উত্তর: তথ্য যাচাই না করে কাজ করলে তার ফলাফল ভুল হতে পারে বলে আমি মনে করি। এক্ষেত্রে আমাদের প্রচুর সময় নষ্ট হয়। অন্যের প্রতি অবিশ্বাস বাড়ে পাশাপাশি নিজের প্রতি অনাস্থাও তৈরি হয়। সামজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নষ্ট হয়।

৩। কোনো তথ্য বা ঘটনার যথার্থতা কীভাবে যাচাই করতে হয়?

on next page

০৩. কোনো তথ্য বা ঘটনার যথার্থতা কীভাবে যাচাই করতে হয়?

উত্তর: কোনো বক্তব্য, মন্তব্য, ঘটনা বা বিষয়েক মনোযোগ সহকারে দেখে, শুনে, স্পর্শ করে এবং যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে এর যথার্থতা যাচাই করতে হয়। তথ্য বা ঘটনার উৎস নির্ভরযোগ্য কি না, ছবি বা ভিডিও এডিট করা কি না তা গুগলে সার্চ করার মাধ্যমে জানা যায়। কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র বা সংবাদ মাধ্যমে খোঁজ করতে হয়। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী উদ্দেশ্য প্রাণোদিত ভাবে গুজব ছড়াচ্ছে কি না তা নিশ্চিত হতে হয়।

## ‘পণ্ডশ্রম’ কবিতার বৈশিষ্ট্য

‘পণ্ডশ্রম’ একটি ছড়া-জাতীয় কবিতা। এখানে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায়:

১। ‘পণ্ডশ্রম’ কবিতায় একটি সামাজিক বিষয়কে ব্যঙ্গার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই ছড়ার মূল বিষয়—কোনো কিছু ঠিকমতো না যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে নেই। চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে, বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে তবেই কাজে নামতে হয়।

২। এই কবিতায় প্রতি স্তবকের দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষে মিল রয়েছে। যেমন: চিলে-মিলে, উড়ে-খুঁড়ে ইত্যাদি।

৩। কবিতাটি তালে তালে পড়া যায়। যেমন:

/এই নিয়েছে /ঐ নিল যা
/কান নিয়েছে /চিলে।
/চিলের পিছে /ঘুরছি মরে
/আমরা সবাই /মিলে।

৪। এই কবিতার তাল অল্প ব্যবধানের এবং এর গতি বা লয় দ্রুত।

৫। কবিতাটিতে শব্দরূপের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন: নেই—নেইকো, সেখানেই—সেখানটাতেই, নয়—নয়কো ইত্যাদি।

## কবিতা পড়ি ২

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলাদেশের জাতীয় কবি। বিদ্রোহী কবি হিসেবেও তিনি পরিচিত। তাঁর কবিতায় অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। কবিতা ছাড়াও তিনি গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও অসংখ্য গান রচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি বইয়ের নাম 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশি', 'মৃত্যুক্ষুধা', 'যুগবাণী' ইত্যাদি। নিচের 'সাম্যবাদী' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কবিতার বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

# সাম্যবাদী

### কাজী নজরুল ইসলাম

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।

গাহি সাম্যের গান!
কে তুমি? — পার্সি? জৈন? ইহুদি? সাঁওতাল, ভিল, গারো?
কনফুসিয়াস? চার্বাক-চেলা? বলে যাও, বলো আরো!

বন্ধু, যা খুশি হও,
পেটে-পিঠে, কাঁধে-মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক–
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব পড়ে যাও যত শখ—
কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর-কষাকষি?—পথে ফোটে তাজা ফুল!
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।
কেন খুঁজে ফের দেবতা-ঠাকুর মৃত-পুঁথি-কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!
বন্ধু, বলিনি ঝুট,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।

এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হলো মেষের রাখাল নবিরা খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি
ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান!
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই।

## শব্দের অর্থ

**আরব-দুলাল:** আরব দেশের সন্তান।

**ইহুদি:** ধর্মসম্প্রদায়ের নাম।

**কনফুসিয়াস:** চীনা দার্শনিক।

**কন্দর:** গুহা।

**কাশী:** হিন্দুদের তীর্থস্থান।

**গারো:** নৃগোষ্ঠীর নাম।

**গ্রন্থসাহেব:** শিখ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ।

**চার্বাক:** প্রাচীন ভারতের একজন দার্শনিক।

**জেন্দাবেস্তা:** প্রাচীন ইরানের একটি ধর্মগ্রন্থ।

**জৈন:** ধর্মসম্প্রদায়ের নাম।

**ঝুট:** মিথ্যা।

**ত্রিপিটক:** বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ।

**দেউল:** মন্দির।

**নীলাচল:** উড়িষ্যার পুরীতে অবস্থিত একটি তীর্থস্থান।

**পার্সি:** ইরানের অগ্নি-উপাসক একটি সম্প্রদায়।

**পুরাণ:** হিন্দুধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কাহিনি সংবলিত গ্রন্থ, যেমন– রামায়ণ, মহাভারত।

**বাইবেল:** খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ।

**বুদ্ধ-গয়া:** ভারতের বিহার প্রদেশে অবস্থিত বৌদ্ধদের তীর্থস্থান।

**বৃন্দাবন:** হিন্দুদের তীর্থস্থান।

**বেদ-বেদান্ত:** হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ।

**ভিল:** নৃগোষ্ঠীর নাম।

**মথুরা:** হিন্দুদের তীর্থস্থান।

**মদিনা:** সৌদি আরবে অবস্থিত মুসলমানদের পুণ্যভূমি।

**যুগাবতার:** বিশেষ যুগে জন্মগ্রহণকারী মহাপুরুষ বা অবতার।

**শাক্যমুনি:** গৌতম বুদ্ধের একটি নাম।

**শূল:** তীক্ষ্ণমুখ বল্লম বিশেষ।

**সাঁওতাল:** নৃগোষ্ঠীর নাম।

**সাম-গান:** সুমধুর বাণী।

**সাম্য:** সমতা।

**সাম্যবাদ:** মানুষের সমান অধিকার বিষয়ক মতবাদ।

**হানা:** বিদ্ধ করা।

## ৬.১.৪ কবিতার গঠন বুঝি

'সাম্যবাদী' কবিতায় অন্ত্যমিল আছে কি না, তাল দিয়ে পড়া যায় কি না, শব্দরূপের পরিবর্তন ঘটেছে কি না, কোনো স্তবক আছে কি না, পড়ার গতি বা লয় কেমন, এবং উপমার প্রয়োগ হয়েছে কি না–এসব নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো। next page

## ৬.১.৫ জীবনের সাথে কবিতার সম্পর্ক খুঁজি

'সাম্যবাদী' কবিতার আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

- 'সাম্যবাদী' কবিতার চরণের শেষে অন্ত্যমিল আছে। যেমন: শূল-ফুল, গীতা-মিতা ইত্যাদি।
- কবিতাটি তালে তালে পড়া যায়। যেমন: গাহি সাম্যের গান/গান- যেখানে আসিয়া/এক হয়ে গেছে/সব বাধা ব্যবধ্যান।
- কবিতাটিতে শব্দরূপের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন: এসে-আসিয়া, বহন করো-বও, তোমার মধ্যে-তোমাতে, ত্যাগ করল-ত্যাজিল, বসে-বসি।
- এই কবিতায় স্তবক আছে।
- কবিতাটির লয় ও গতি খুব দ্রুতও নয় আবার ধীরও নয়, মাঝারি।
- কবিতায় উপমা ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: হৃদয়ের ধ্যান-গুহা- এখানে- হৃদয়কে গুহার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

১। কবিতাটিতে কবি যেসব জাতি, ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, ধর্মপ্রচারক ও ধর্মীয় স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন, তার তালিকা তৈরি করো।

জাতির নাম: জাতির নাম: পার্সি, জৈন, ইহুদি, সাঁওতাল, ভিল, গারো

ধর্মের নাম: ধর্মের নাম: হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রিষ্টান।

ধর্মগ্রন্থের নাম: ধর্মগ্রন্থের নাম: কোরআন, বেদ, বাইবেল, ত্রিপিটক, জেন্দাবেস্তা, গ্রন্থসাহেব।

ধর্মপ্রচারকের নাম: ধর্মপ্রচারকের নাম: ঈসা(আ), মুসা(আ), শ্রী কৃষ্ণ, শাক্যমুনি, হজরত মুহাম্মদ (স.)

ধর্মীয় স্থানের নাম: ধর্মীয় স্থানের নাম: নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, জেরুজালেম, মদিনা, কাবা-ভবন, মন্দির, গির্জা।

২। 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি কী বলতে চেয়েছেন? কবির বক্তব্যের সঙ্গে তোমার মতের মিল-অমিল উল্লেখ করো।

উত্তর: 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন ধর্ম-বর্ণ গোত্র ভেদে সকল মানুষ সমান। সকল কিছুর উর্ধ্বে উঠে তিনি সাম্যবাদ ও মানবতাবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি যা বলতে চেয়েছেন আমি সেই বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করি। আমিও বিশ্বাস করি পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান, সবকিছুর উপরে। জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান মর্যাদা দান করা উচিত। মানুষের মানুষ পরিচয়কে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

৩। তোমার চারপাশের সমাজে মানুষে মানুষে কী কী ধরনের বিভেদ দেখা যায়? এসব বিভেদ কীভাবে দূর করা যায় বলে তুমি মনে করো?

Answer on next page

০৩. তোমার চারপাশের সমাজে মানুষে মানুষে কী কী ধরনের বিভেদ দেখা যায়? এসব বিভেদ কীভাবে দূর করা যায় বলে তুমি মনে করো?

উত্তর: আমার চারপাশের সমাজে মানুষে মানুষে ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, বংশগত, সম্প্রদায়গত ও অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য দেখা যায়। আমি মনে করি এসব বৈষম্য চাইলে সমাজ থেকে দূর করা যায়। মানুষকে ভালোবেসে, সহমর্মিতা প্রকাশ করে বুকে টেনে নেওয়া যায়। ধর্ম, অর্থ, বংশ, সম্প্রদায় ও অঞ্চল দিয়ে মানুষের বিচার না করে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষকে মূল্যায়ন করে সবার উপরে স্থান দেওয়া যায়।

## ‘সাম্যবাদী’ কবিতার বৈশিষ্ট্য

১। ‘সাম্যবাদী’ কবিতার মূল বিষয়—মানবতা ও সাম্যবাদ। এখানে কবি ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সব মানুষকে সমান চোখে দেখার কথা বলেছেন।

২। কবিতাটিতে প্রতি জোড়া চরণের শেষে মিল আছে। যেমন: গারো-আরো, হও-বও ইত্যাদি।

৩। কবিতাটি তালে তালে পড়া যায়। যেমন,

/গাহি /সাম্যের গান—

/যেখানে আসিয়া /এক হয়ে গেছে /সব বাধা-ব্যব/ধান

/যেখানে মিশেছে /হিন্দু-বৌদ্ধ-/মুসলিম-ক্রিশ্/চান।

/গাহি /সাম্যের গান!

/কে তুমি?—পার্সি? /জৈন? ইহুদি? /সাঁওতাল, ভিল, /গারো?

/কন্‌ফুসিয়াস্? /চার্বাক-চেলা? /বলে যাও, বলো /আরো!

৪। কবিতাটির লয় মাঝারি; অর্থাৎ দ্রুতও নয়, ধীরও নয়।

৫। কবিতাটিতে শব্দরূপের কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন: এসে—আসিয়া, বহন করো—বও, তোমার মধ্যে—তোমাতে, ত্যাগ করল—ত্যজিল, বসে—বসি ইত্যাদি।

৬। এই কবিতায় উপমার ব্যবহার আছে। যেমন: ‘হৃদয়ের ধ্যান-গুহা’—এখানে হৃদয়কে গুহার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

## কবিতা পড়ি ৩

সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯) বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় কবি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম 'সাঁঝের মায়া', 'মায়া কাজল', 'কেয়ার কাঁটা' ইত্যাদি। শিশুদের জন্য লেখা তাঁর একটি ছড়ার বই 'ইতল বিতল'। 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতাটি সুফিয়া কামালের 'উদাত্ত পৃথিবী' কবিতার বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

# জাগো তবে অরণ্য কন্যারা

### সুফিয়া কামাল

মৌসুমি ফুলের গান মোর কণ্ঠে জাগে নাকো আর
চারিদিকে শুনি হাহাকার।
ফুলের ফসল নেই, নেই কারো কণ্ঠে আর গান
ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত দৃষ্টি প্রাণহীন সব মুখ ম্লান।

মাটি অরণ্যের পানে চায়
সেখানে ক্ষরিছে স্নেহ পল্লবের নিবিড় ছায়ায়।
জাগো তবে অরণ্য কন্যারা! জাগো আজি,
মর্মরে মর্মরে ওঠে বাজি
বৃক্ষের বক্ষের বহ্নিজ্বালা
মেলি লেলিহান শিখা তোমরা জাগিয়া ওঠো বালা!
কঙ্কণে তুলিয়া ছন্দ তান
জাগাও মুমূর্ষু ধরা-প্রাণ
ফুলের ফসল আনো, খাদ্য আনো ক্ষুধার্তের লাগি
আত্মার আনন্দ আনো, আনো যারা রহিয়াছে জাগি
তিমির প্রহর ভরি অতন্দ্র নয়ন, তার তরে
ছড়াও প্রভাত আলো তোমাদের মুঠি ভরে ভরে।

(সংক্ষেপিত)

## শব্দের অর্থ

**অতন্দ্র:** ঘুমহীন।

**কঙ্কণ:** চুড়ি।

**ক্ষরিছে:** ঝরছে; চুয়ে চুয়ে পড়ছে।

**ক্ষুধার্ত:** ক্ষুধায় কাতর।

**ধরা-প্রাণ:** পৃথিবীর প্রাণী।

**পল্লব:** গাছের কচি পাতা।

**বহ্নিজ্বালা:** আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা।

**ভয়ার্ত:** ভয়াতুর।

**মুমূর্ষু:** মরে যাচ্ছে এমন।

**ম্লান:** মলিন।

**লেলিহান শিখা:** ছড়িয়ে পড়তে চায় এমন আগুন।

## ৬.১.৬ কবিতার গঠন বুঝি

‘জাগো তবে অরণ্য কন্যারা’ কবিতায় অন্ত্যমিল আছে কি না, তাল দিয়ে পড়া যায় কি না, শব্দরূপের পরিবর্তন ঘটেছে কি না, কোনো স্তবক আছে কি না, পড়ার গতি বা লয় কেমন, এবং উপমার প্রয়োগ হয়েছে কি না— এসব নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো।

## ৬.১.৭ জীবনের সাথে কবিতার সম্পর্ক খুঁজি

'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১। 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় প্রকৃতির প্রতি কবির কী ধরনের অনুভূতি ও আবেগ প্রকাশ পেয়েছে?

উত্তর: জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় প্রকৃতির প্রতি কবির ভালোবাসা ও গভীর আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। কবির চারপাশের বৃক্ষনিধন দেখে কবি ব্যথিত ও চিন্তিত। তিনি চান না প্রকৃতি থেকে বৃক্ষেরা হারিয়ে যাক। তাই তিনি বৃক্ষের প্রতি জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি চান এই পৃথিবী ফুলে-ফসলে, সবুজে-শ্যামলে ভরে উঠুক।

২। 'ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত দৃষ্টি প্রাণহীন সব মুখ ম্লান।'—এ কথা দিয়ে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর: 'ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত দৃষ্টি প্রাণহীন সব মুখ ম্লান'- বলতে কবি অরণ্যের সংকটময় পরিস্থিতিকে বুঝিয়েছেন। পৃথিবীর মানুষেরা নির্দ্বিধায় বন উজাড় করে ফেলছে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে, তাই অরণ্য ক্রমশ ক্ষুধায় কাতর, ভয়াতুর ও নির্জীব হচ্ছে। অরণ্য মাটি থেকে পাণি শোষণ করতে পারছে না। কেননা প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারিয়েছে। খাদ্যের জোগান দিতে না পেরে মাটি অরণ্যের দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। কিন্তু মাটির স্নেহ মন ভরালেও তা দেহে খাদ্যের জোগান দেয় না, ফলে গাছপালা ক্ষুধার্ত। এই ক্ষুধার জ্বালা অরণ্যকে করেছে ভীত, প্রাণহীন আর মুখকে করেছে ম্লান।

৩। তোমার চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশের বিবরণ দাও। এ পরিবেশ তোমার কেমন লাগে?

উত্তর: আমার চারপাশে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল তবে বর্তমানে তা হারাতে বসেছে। রাস্তা চওড়া করার নামে রাস্তায় দু'পাশের গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। নদী ভরাট করে স্থাপনা বানানো হচ্ছে। বনজঙ্গল উজাড় করে বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস করে পার্ক বানানো হচ্ছে। এ পরিবেশ আমার ভালো লাগে না। আমার ভালো লাগে মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ, অসংখ্য গাছপালা আর পাখপাখালি।

## 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার বৈশিষ্ট্য

১। 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার মূল ভাব প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা। চারপাশে চলছে বৃক্ষ-নিধন; কবি তাতে ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন। এই অবস্থায় কবি বৃক্ষদের জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি চান সবুজে সবুজে, ফুলে ও ফসলে পৃথিবী ভরে উঠুক।

২। কবিতাটিতে প্রতি দুই চরণের শেষে মিল আছে। যেমন: আজি-বাজি, জ্বালা-বালা ইত্যাদি।

৩। কবিতাটি তাল দিয়ে পড়া যায়; তবে এই তালের ব্যবধান দীর্ঘ। যেমন:

/মৌসুমি ফুলের গান /মোর কণ্ঠে জাগে নাকো আর

/চারিদিকে শুনি হাহাকার।

/ফুলের ফসল নেই, /নেই কারো কণ্ঠে আর গান

/ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত দৃষ্টি /প্রাণহীন সব মুখ ম্লান।

৪। কবিতার লয় বা গতি ধীর।

৫। কবিতাটিতে কিছু শব্দরূপের পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন: আমার—মোর, না—নাকো, দিকে—পানে, ঝরছে—ক্ষরিছে, আজ—আজি, মেলে—মেলি, জন্য—লাগি, রয়েছে—রহিয়াছে, ভরে—ভরি, জন্য—তরে ইত্যাদি। প্রমিত ভাষার শব্দরূপ এমন নয়।

৬। এই কবিতায় উপমার ব্যবহার আছে। যেমন: 'সেখানে ক্ষরিছে স্নেহ পল্লবের নিবিড় ছায়ায়।'—কবি এখানে কচি পাতার ছায়াকে স্নেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

## কবিতা পড়ি ৪

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান কবি। তাঁর কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় প্রকাশ ঘটেছে। জীবনানন্দের উল্লেখযোগ্য কবিতার বইয়ের নাম 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির' ইত্যাদি। 'তোমরা যেখানে সাধ' কবিতাটি কবির 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

# তোমরা যেখানে সাধ

### জীবনানন্দ দাশ

তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে
রয়ে যাব; দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে;

দেখিব খয়েরি ডানা শালিখের সন্ধ্যায় হিম হয়ে আসে
ধবল রোমের নিচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে
নেচে চলে—একবার—দুইবার—তারপর হঠাৎ তাহারে
বনের হিজল গাছ ডাক দিয়ে নিয়ে যায় হৃদয়ের পাশে;
দেখিব মেয়েলি হাত সকরুণ—শাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে
শঙ্খের মতো কাঁদে: সন্ধ্যায় দাঁড়াল সে পুকুরের ধারে,

খইরঙা হাঁসটিরে নিয়ে যাবে যেন কোন কাহিনির দেশে—
'পরন-কথা'র গন্ধ লেগে আছে যেন তার নরম শরীরে,
কলমিদামের থেকে জন্মেছে সে যেন এই পুকুরের নীড়ে—
নীরবে পা ধোয় জলে একবার—তারপর দূরে নিরুদ্দেশে
চলে যায় কুয়াশায়,—তবু জানি কোনোদিন পৃথিবীর ভিড়ে
হারাব না তারে আমি—সে যে আছে আমার এ বাংলার তীরে।

## শব্দের অর্থ

**কলমিদাম:** কলমিলতার গুচ্ছ।
**খইরঙা:** খইয়ের মতো রঙের।
**ধবল রোম:** সাদা লোম।
**ধূসর:** ছাই রঙা।
**নিরুদ্দেশে:** অজানার পথে।
**নীড়:** বাসা।
**পরন-কথা:** রূপকথা।
**শঙ্খ:** সামুদ্রিক শামুক বিশেষ।
**শাঁখা:** সাদা চুড়ি বিশেষ।
**সকরুণ:** বেদনাযুক্ত।
**হিম:** ঠান্ডা।

## ৬.১.৮ কবিতার গঠন বুঝি

'তোমরা যেখানে সাধ' কবিতায় অন্ত্যমিল আছে কি না, তাল দিয়ে পড়া যায় কি না, শব্দরূপের পরিবর্তন ঘটেছে কি না, কোনো স্তবক আছে কি না, পড়ার গতি বা লয় কেমন, এবং উপমার প্রয়োগ হয়েছে কি না—এসব নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো।

## ৬.১.৯ জীবনের সাথে কবিতার সম্পর্ক খুঁজি

'তোমরা যেখানে সাধ' কবিতার আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১। 'আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব'—কবি কেন এমন কথা বলেছেন?

উত্তর: আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব' কবি এ কথা বলেছেন কারণ তিনি বাংলাদেশের প্রাকৃতকি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন। তাই সবাই এই দেশ ত্যাগ করলেও তিনি এদেশেই রয়ে যেতে চেয়েছেন। তিনি ভোরের বাতাসে কাঁঠালপাতার ঝরে পড়া দেখতে চেয়েছেন, সন্ধ্যাবেলায় শালিকের হিজলবনে লুকানো দেখতে চেয়েছেন। গৃহবধূর হাঁস ধরে নিয়ে বাসায় ফেরা তারপর কুয়াশার ভেথর নিরুদ্দেশে হারিয়ে যাওয়া দেখতে চেয়েছেন। তিনি জানেন এসবই তিনি খুঁজে পাবেন বাংলার তীরে তাই তিনি এদেশ ত্যাগ করে অন্য কোথাও যেতে চাননি।

২। দেশপ্রেম সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? এই কবিতায় কীভাবে দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে?

উত্তর: দেশপ্রেম হলো নিজের দেশের প্রতি, জাতির প্রতি, ভাষার প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করা। দেশের প্রতি প্রবল অনুরাগ, নিবিড় ভালোবাসা ও আনুগত্যকে দেশপ্রেম বলে। আমার মতে জন্মভূমির স্বার্থে নিজেকে উৎসর্গ করার সাধনাই দেশপ্রেম। এই কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যমে কবির দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে। তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ভালোবেসে কবি আমৃত্যু এদেশে রয়ে যেতে চেয়েছেন।

৩। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের কোন দিকগুলো তোমার ভালো লাগে বা খারাপ লাগে?

উত্তর: ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপরূপ লীলাভূমি। এ দেশের সবুজ বনানী, নদনদী, পাহাড়-পর্বত, বিস্তীর্ণ সমুদ্রসৈকত দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়। এ দেশে বারো মাসে ছয়টি ঋতু অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে আগমন করে এবং অনাবিল সৌন্দর্য উপহার দেয়। প্রতিটি ঋতুতে প্রকৃতির পরিবর্তন হয়, ক্ষণে ক্ষণে আকাশের রং বদলায়। প্রকৃতির এই পট পরিবর্তন আমার হৃদয় আনন্দে ভরিয়ে তোলে। গ্রীষ্মে প্রচণ্ড রোদের সঙ্গে ছাতিমের স্নিগ্ধছায়া, বর্ষার হৃদয় আকুল করা বর্ষণ, শরতের স্নিগ্ধ সাদা কাশফুল আর নীল আকাশ, হেমন্তের নতুন ফসলের গন্ধ, নবান্ন উৎসব, শীতের রিক্ততা, পিঠে-পুলি খাওয়ার ধুম আর বসন্তের ঝিরিঝিরি বাতাস আর রঙিন প্রকৃতি আমার এ দেশের প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা বহু গুণে বাড়িয়ে তোলে।

## ‘তোমরা যেখানে সাধ’ কবিতার বৈশিষ্ট্য

১। ‘তোমরা যেখানে সাধ’ একটি দেশপ্রেমের কবিতা। এই কবিতায় কবি বাংলাদেশের প্রকৃতির সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন। এই সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন বলে তিনি এখান থেকে আর কোথাও যেতে চান না।

২। এই কবিতার প্রতি চরণের শেষে মিল আছে, তবে তা বিশেষ নিয়মে। যেমন: ১ম চরণে ‘পারে’ শব্দের সাথে মিলিয়ে ৪র্থ চরণে ‘অন্ধকারে’, ৫ম চরণে ‘তাহারে’ এবং ৮ম চরণে ‘ধারে’ আছে। আবার, ২য় চরণের ‘বাতাসে’ শব্দের সাথে মিলিয়ে ৩য় চরণে ‘আসে’, ৬ষ্ঠ চরণে ‘পাশে’ এবং ৭ম চরণে ‘বাতাসে’ আছে।

৩। কবিতাটি তাল দিয়ে পড়া যায়; তবে এই তালের ব্যবধান বেশ দীর্ঘ। যেমন:

/তোমরা যেখানে সাধ /চলে যাও—আমি এই /বাংলার পারে

/রয়ে যাব; দেখিব কাঁ/ঠালপাতা ঝরিতেছে /ভোরের বাতাসে;

/দেখিব খয়েরি ডানা /শালিখের সন্ধ্যায় /হিম হয়ে আসে

/ধবল রোমের নিচে /তাহার হলুদ ঠ্যাং /ঘাসে অন্ধকারে

৪। কবিতার লয় বা গতি ধীর।

৫। কবিতাটিতে কিছু শব্দরূপের পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন: থেকে—রয়ে, ঝরছে—ঝরিতেছে, পা—ঠ্যাং, তাকে—তারে ইত্যাদি।

৬। এই কবিতায় উপমার ব্যবহার আছে। যেমন: ‘শাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে শঙ্খের মতো কাঁদে’—এখানে চুড়ির শব্দকে শঙ্খের সুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

## কবিতা পড়ি ৫

সিকান্‌দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫) বাংলাদেশের একজন কবি ও নাট্যকার। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম 'প্রসন্ন প্রহর', 'বৈরী বৃষ্টিতে', 'সিরাজউদ্দৌলা' ইত্যাদি। 'আশা' কবিতাটি তাঁর 'মালব কৌশিক' কবিতার বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

# আশা

### সিকান্‌দার আবু জাফর

আমি সেই জগতে হারিয়ে যেতে চাই,
যেথায় গভীর-নিশুত রাতে
জীর্ণ বেড়ার ঘরে
নির্ভাবনায় মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে ভাই॥

যেথায় লোকে সোনা-রুপায়
পাহাড় জমায় না,
বিত্ত-সুখের দুর্ভাবনায়
আয়ু কমায় না;
যেথায় লোকে তুচ্ছ নিয়ে
তুষ্ট থাকে ভাই॥

সারাদিনের পরিশ্রমেও
পায় না যারা খুঁজে
একটি দিনের আহার্য-সঞ্চয়,
তবু যাদের মনের কোণে
নেই দুরাশা গ্লানি,
নেই দীনতা, নেই কোনো সংশয়॥

যেথায় মানুষ মানুষেরে
বাসতে পারে ভালো
প্রতিবেশীর আঁধার ঘরে
জ্বালতে পারে আলো,
সেই জগতের কান্না-হাসির
অন্তরালে ভাই
আমি হারিয়ে যেতে চাই॥

## শব্দের অর্থ

**অন্তরালে:** আড়ালে।

**আহার্য:** খাবার।

**গ্লানি:** অনুতাপ।

**জীর্ণ:** পুরাতন।

**দীনতা:** গরিব অবস্থা।

**দুর্ভাবনা:** দুশ্চিন্তা।

**দুরাশা:** সহজে পাওয়া যায় না এমন কিছু লাভ করার আশা।

**নির্ভাবনায়:** ভাবনাহীনভাবে।

**নিশুত রাতে:** গভীর রাতে।

## ৬.১.১০ কবিতার গঠন বুঝি

'আশা' কবিতায় অন্ত্যমিল আছে কি না, তাল দিয়ে পড়া যায় কি না, শব্দরূপের পরিবর্তন ঘটেছে কি না, কোনো স্তবক আছে কি না, পড়ার গতি বা লয় কেমন এবং উপমার প্রয়োগ হয়েছে কি না—এসব নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো। next page

## ৬.১.১১ জীবনের সাথে কবিতার সম্পর্ক খুঁজি

'আশা' কবিতার আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১। 'আশা' কবিতায় কবি কী বলতে চেয়েছেন?

উত্তর: 'আশা' কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন কবি যেই পৃথিবীতে হারিয়ে যেতে চান সেখানে মানুষ জীর্ণ বেড়ার ঘরে নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে থাকে। সেখানে মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়ার দুশ্চিন্তা করে জীবনের সুখ বিসর্জন দেয় না এবং অল্পতেই তুষ্ট হয়। যারা সারাদিন পরিশ্রম করে পর্যাপ্ত আহর কিংবা টাকা সঞ্চয় করতে না পারলেও মনের ভিতর হতাশা, গ্লানি কিংবা দ্বিধা পুষে রাখে না। যেখানে মানুষ মানুষকে ভালোবাসে। প্রতিবেশীর পিবদে এগিয়ে আসে সেই জগতে কবি হারিয়ে যেতে চান।

২। কবি মনে করেন, বিত্তসুখের দুর্ভাবনায় আয়ু কমে। তোমার মতে, অর্থবিত্তের সঙ্গে মানুষের আয়ু কমার কোনো সম্পর্ক আছে কি না?

উত্তর: বিত্ত-সুখের দুর্ভাবনায় আয়ু কমে' কবির এই মতের সঙ্গে আমি একমত। কেননা অর্থবিত্তের পেছনে ছুটে বেড়ানো এক ধরনের অসুখ। যে অসুখের কোনো নিরাময় নেই। মানুষ অধিক অর্থবিত্ত লোভের আশায় নিজেদের স্বাভাবিক সুখ-সুবিধা বিসর্জন দেয়। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ায়, যা তাকে নিঃসঙ্গ করে তোলে। এই নিঃসঙ্গতা একসময় তার ভিতরে মানসিক চাপের সৃষ্টি করে। বিত্তসুখ অর্জনের মাধ্যমে অপরকে টপকে যাওয়ার চিন্তা মানুষকে আরও বিমর্ষ করে তোলে। স্বাভাবিক সামাজিক, পারিবারিক এবং আত্মিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয়, যা মনের সঙ্গে শরীরকেও প্রভাবিত করে। ফলে অর্থবিত্তের সঙ্গে মানুষের আয়ু কমার সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি। কেননা মানসিক চাপ নানা ধরনের শারীরিক অসুখের প্রধান উৎপত্তিস্থল।

## কবিতার কাঠামো বুঝি- আশা

০১. 'আশা' কবিতার চরণগুলোতে অন্ত্যমিল রয়েছে, তবে তা একটু ভিন্ন নিয়মে রয়েছে। যেমন:

আমি সেই জগতে হারিয়ে যেতে চাই,
যেখানে গভীর-নিশুত রাতে
জীর্ণ বেড়ার ঘরে
নির্ভাবনায় মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে ভাই

এখানে প্রথম চরণের 'চাই' - এর সঙ্গে চতুর্থ চরণের 'ভাই' শব্দের মিল রয়েছে। আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে' 'রাতে'- এর সঙ্গে 'ঘরে' শব্দের মিল রয়েছে। অর্থাৎ প্রথম চরণের সঙ্গে চতুর্থ চরণের এবং দ্বিতীয় চরণের সঙ্গে তৃতীয় চরণের অন্ত্যমিল লক্ষ করা যায়।

০২. কবিতাটি তাল দিয়ে পড়া যায় এবং কবিতাটির তালের ব্যবধান কম। যেমন:

যেথায় মানুষ মানুষেরে
বাসতে পারে ভালো
প্রতিবেশীর আঁধার ঘরে
জ্বালতে পারে আলো,
সেই জগতের কান্না-হাসির
অন্তরালে ভাই
আমি হারিয়ে যেতে চাই।

০৩. কবিতাটিতে কিছু শব্দরূপের পরিবর্তন হয়েছে। যেমন: যেখানে-যেথায়, নিশীথ-নিশুত, মানুষকে-মানুষেরে, জ্বালাতে-জ্বালতে

০৪. কবিতাটিতে চারটি স্তবক রয়েছে।

৩। তোমার চারপাশের মানুষের মধ্যে কী কী ধরনের দুঃখ-কষ্ট তুমি দেখতে পাও। এগুলো দূর করার জন্য কী কী করা যেতে পারে, তার একটি তালিকা তৈরি করো।

উত্তর: আমার চারপাশের মানুষের মধ্যে আমি নানা ধরনের মানসিক ও শারীরিক দুঃখকষ্ট দেখতে পাই। যেমন-

- কেউ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত।
- কারো পড়ালেখা করার পর্যাপ্ত টাকা নেই।
- কেউ আবার পরিবারের সদস্য হারিয়ে শোকে বিহ্বল।
- কারো-বা খাওয়া-পরার টাকা নেই, বাসস্থান নেই।
- কেউ-বা চাকরি না পেয়ে রাস্তায় ঘুরছে।
- কারো আবার সব থাকলেও মানসিক শান্তি নেই। এগুলো দূর করার জন্য অনেক কিছু করা যেতে পারে বলে আমি মনে করি। যেমন:-

✓ দুস্থকে অর্থনৈতিক সাহায্য করা।
✓ রোগাক্রান্তকে সেবা করা।
✓ সাহায্য প্রার্থীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়ানো।
✓ মানসিকভাবে অসহায়ের পাশে দাঁড়ানো।
✓ আর্তকে সেবা দান ইত্যাদি।

## ‘আশা’ কবি

১। ‘আশা’ ক সব মানুষ দুশ্চিন্তা করে না, অতিরিক্ত সঞ্চয় করে না, পরি কবি তাদের ভালোবাসেন।

২। কবিতাটি যেমন: প্রথম স্তবকে ১ম ও ৪র্থ লাইনে মিল আছে; দ্বিতীয় ছে; আবার তৃতীয় স্তবকে ৩য় ও ৬ষ্ঠ লাইনে মিল দেখা যায়।

৩। কবিতাটি তাল দিয়ে পড়া যায়। তালগুলোর ব্যবধান কম। যেমন:

/আমি /সেই জগতে /হারিয়ে যেতে /চাই,
/যেথায় গভীর-/নিশুত রাতে
/জীর্ণ বেড়ার /ঘরে
/নির্ভাবনায় /মানুষেরা /ঘুমিয়ে থাকে /ভাই॥

/যেথায় লোকে /সোনা-রুপায়
/পাহাড় জমায় /না,
/বিত্ত-সুখের /দুর্ভাবনায়
/আয়ু কমায় /না;
/যেথায় লোকে /তুচ্ছ নিয়ে
/তুষ্ট থাকে /ভাই॥

৪। এই কবিতার লয় বা গতি দ্রুত। এটি একটি ছড়া জাতীয় কবিতা।

৫। কবিতাটিতে কিছু শব্দরূপের পরিবর্তন আছে। যেমন: যেখানে—যেথায়, নিশীথ—নিশুত, মানুষকে—মানুষেরে, জ্বালাতে—জ্বালতে ইত্যাদি।

## কবিতা পড়ি ৬

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) বাংলা ভাষার জনপ্রিয় কবি। মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কবিতায় বঞ্চিত, শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি গভীর মমতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর রচিত বইগুলোর মধ্যে 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই', 'পূর্বাভাস','অভিযান' ও 'হরতাল' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। 'ছাড়পত্র' কবিতাটি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' কবিতার বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

# ছাড়পত্র

### সুকান্ত ভট্টাচার্য

যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম:
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে।

খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত
উত্তোলিত, উদ্ভাসিত
কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়।
সে ভাষা বোঝে না কেউ,
কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার।
আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা।
পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের—
পরিচয়পত্র পড়ি ভূমিষ্ঠ শিশুর
অস্পষ্ট কুয়াশাভরা চোখে।

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,

তারপর হব ইতিহাস॥

## শব্দের অর্থ

**অঙ্গীকার:** প্রতিজ্ঞা।

**খর্বদেহ:** ছোটো শরীর।

**ছাড়পত্র:** অনুমতিপত্র।

**জঞ্জাল:** আবর্জনা।

**তিরস্কার:** ভর্ৎসনা।

**দুর্বোধ্য:** যা সহজে বোঝা যায় না।

**প্রতিজ্ঞা:** অঙ্গীকার।

**ভূমিষ্ঠ হওয়া:** জন্মগ্রহণ করা।

**মৃদু:** অনুচ্চ।

## ৬.১.১২ কবিতার গঠন বুঝি

'ছাড়পত্র' কবিতায় অন্ত্যমিল আছে কি না, তাল দিয়ে পড়া যায় কি না, শব্দরূপের পরিবর্তন ঘটেছে কি না, কোনো স্তবক আছে কি না, পড়ার গতি বা লয় কেমন, এবং উপমার প্রয়োগ হয়েছে কি না—এসব নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো। next page

## ৬.১.১৩ জীবনের সাথে কবিতার সম্পর্ক খুঁজি

'ছাড়পত্র' কবিতার আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১। 'ছাড়পত্র' কবিতায় কবি এই পৃথিবীকে নবজাতকের জন্য বাসযোগ্য মনে করেননি কেন?

উত্তর: 'ছাড়পত্র' কবিতায় কবি এই পৃথিবীকে নবজাতকের জন্য বাসযোগ্য মনে করেননি, কারণ এই পৃথিবী জীর্ণ, ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। নতুন শিশুকে কবি এক নতুন জীবন উপহার দিতে চেয়েছেন, যা এই পুরোনো যুগের বার্তা বহন করা পৃথিবীতে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই কবি সমস্ত জঞ্জাল সরিয়ে পৃথিবীকে শিশুর জন্য বাসযোগ্য করতে চেয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে এই পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত তাই এই পৃথিবী কবির কাছে নবজাতকের জন্য বাসযোগ্য মনে হয়নি।


শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

## কবিতার গঠন বুঝি- ছাড়পত্র

০১. ছাড়পত্র' কবিতায় কোনো অন্ত্যমিল নেই।

০২. কবিতাটি তাল দিয়ে পড়া যায়, তবে প্রতিটি চরণের তাল নির্দিষ্ট ব্যবধানের নয়। যেমন: এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান; জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে চলে যেতে হবে আমাদের।

চলে যাব-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল, এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি- নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,
তারপর হব ইতিহাস।

০৩. কবিতাটিতে কিছু শব্দরূপের পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন: রাত্রে-রাত্রে, পেলাম-পেলুম, শেষ করে-সেরে ইত্যাদি।

০৪. কবিতাটিতে তিনটি স্তবক রয়েছে।

০৫. কবিতাটি পড়ার গতি বা লয় ধীর।

০৬. কবিতাটিতে উপমা ব্যবহার করা হয়েছে। 'অস্পষ্ট কুয়াশাভরা চোখে'- এখানে চোখের অস্পষ্ট দৃষ্টিকে কুয়াশার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

২। 'প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল'—এই বাক্য দিয়ে কবি পুরানো ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছেন। সব ধরনের পুরাতন ব্যবস্থা, চিন্তা ও বিশ্বাস কি পরিবর্তন করা প্রয়োজন মনে করো? তোমার মত সংক্ষেপে তুলে ধরো।

উত্তর: কবি 'প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল' - এই বাক্যটি কবিতায় ব্যবহার করে পৃথিবীর পুরোনো ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছেন। তবে আমি সব ধরনের পুরাতন ব্যবস্থা, চিন্তা ও বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটাতে চাই না। আমি শুধু সেইসব পুরাতন ব্যবস্থা, চিন্তা ও বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটাতে চাই, যা মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদাদানকে বাধাগ্রস্থ করে। হানাহানি ও বৈষম্য সৃষ্টি করে, রোগ-শোকের সৃষ্টি করে। যেসব পুরাতন ব্যবস্থা, চিন্তা ও বিশ্বাস মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে, সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, বৈষম্যের অবসান ঘটায় সেসব ব্যবস্থার পরিবর্তন আমি চাই না।

৩। তোমার পরিবার, বিদ্যালয় বা সমাজের কোন বিষয়গুলো পরিবর্তন করা হলে তা সবার জন্য মঙ্গলকর হবে বলে মনে করো?

উত্তর: আমার পরিবার, বিদ্যালয় বা সমাজের যে দিকগুলো পরিবর্তন করা হলে সবার জন্য মঙ্গলকর হবে বলে আমি মনে করি তা হলো-

(ক) আমার পরিবারে সবাইকে সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। মতামতের প্রাধান্য দিতে হবে এবং সবার কথা মনোযোগসহকারে শুনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাহলে তা সবার জন্য মঙ্গলকর হবে।

(খ) আমার বিদ্যালয়ে আনন্দঘন পরিবেশে পাঠ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) আমার সমাজে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, অর্থবিত্ত এব বংশগত বৈষম্য না করে মানুষকে মানুষ হিসেবে সমান মর্যাদা দান করতে হবে।

(ঘ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতিমুক্ত করতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

## ‘ছাড়পত্র’ কবিতার বৈশিষ্ট্য

১। ‘ছাড়পত্র’ কবিতার মূল ভাব—পৃথিবীকে নতুন প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য করে তোলা।

২। কবিতাটির চরণের শেষে কোনো মিল নেই।

৩। এই কবিতায় এক ধরনের তাল আছে; তবে সেই তাল নির্দিষ্ট ব্যবধানের নয়। যেমন:

/যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো /আজ রাত্রে

/তার মুখে /খবর পেলুম:

/সে পেয়েছে /ছাড়পত্র এক,

/নতুন বিশ্বের দ্বারে /তাই ব্যক্ত /করে অধিকার

/জন্মমাত্র /সুতীব্র চিৎকারে।

/খর্বদেহ নিঃসহায়, /তবু তার /মুষ্টিবদ্ধ হাত

/উত্তোলিত, উদ্ভাসিত

/কী এক দুর্বোধ্য /প্রতিজ্ঞায়।

৪। এই কবিতার গতি বা লয় ধীর।

৫। কবিতাটিতে কিছু শব্দরূপের পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন: রাতে—রাত্রে, পেলাম—পেলুম, শেষ করে—সেরে ইত্যাদি।

৬। এই কবিতায় উপমার ব্যবহার আছে। যেমন: ‘অস্পষ্ট কুয়াশাভরা চোখে’—এখানে চোখের অস্পষ্ট দৃষ্টিকে কুয়াশার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

## ৬.১.১৪ কবিতার বৈশিষ্ট্য যাচাই করি

এই পরিচ্ছেদে মোট ছয়টি কবিতা পড়েছ। কবিতাগুলোর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিচের ছকটি পূরণ করো। প্রথমটির নমুনা উত্তর করে দেওয়া হলো। কাজটি প্রথমে নিজে করবে, এরপর শিক্ষকের পরামর্শ নিয়ে নিজের উত্তর চূড়ান্ত করবে।

| কবিতার নাম | কবিতার নাম | চরণের শেষে মিল আছে কি না | তাল কেমন | লয় বা গতি কেমন | শব্দরূপের পরিবর্তন দেখা যায় কি না | উপমা আছে কি না |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. পণ্ডশ্রম | পণ্ডশ্রম | আছে। যেমন: চিলে-মিলে | অল্প ব্যবধানের | দ্রুত | দেখা যায়। যেমন: নেই-নেইকো | আছে |
| ২. 'সাম্যবাদী' | সাম্যবাদী | আছে। যেমন: পারো-আরো | দীর্ঘ ব্যবধানের | মাঝারি | দেখা যায়। যেমন: এসে-আসিয়া | আছে |
| ৩. 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' | জাগো তবে অরণ্য কন্যারা | আছে। যেমন: আজি-বাজি | দীর্ঘ ব্যবধানের | ধীর | দেখা যায় যেমন: আমার-মোর | আছে |
| ৪. 'তোমরা যেখানে সাধ' | তোমরা যেখানে সাধ | বিশেষ ধরনের মিল আছে | দীর্ঘ ব্যবধানের | ধীর | দেখা যায়। যেমন: থেকে-রয়ে | আছে |
| ৫. 'আশা' | আশা | বিশেষ ধরনের মিল আছে | অল্প ব্যবধানের | দ্রুত | দেখা যায়। যেমন: | নেই |
| | | মিল আছে | ব্যবধানের | | যেমন: মানুষকে-মানুষেরে | |
| ৬. 'ছাড়পত্র' | ছাড়পত্র | মিল নেই | নির্দিষ্ট ব্যবধানের নয় | ধীর | দেখা যায়। যেমন: পেলাম-পেলুম | আছে |

## ৬.১.১৫ কবিতা লিখি ও যাচাই করি

যে কোনো একটি বিষয় নির্ধারণ করে এটিকে ছড়া বা সমিল কবিতায় প্রকাশ করো অথবা প্রথমে যে কবিতাটি লিখেছিলে সেটি পরিমার্জন করো। লেখা হয়ে গেলে তোমার কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে বের করো। প্রয়োজনে শিক্ষক ও সহপাঠীর সহযোগিতা নাও।

## ২য় পরিচ্ছেদ

# গল্প

## ৬.২.১ গল্প লিখি

পূর্ববর্তী শ্রেণিগুলোতে তোমরা গল্প নিয়ে কিছু ধারণা পেয়েছ। গল্পের কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ ইত্যাদি সম্পর্কে জেনেছ। এখন তোমার জীবনে ঘটে-যাওয়া কোনো ঘটনা কিংবা সাম্প্রতিক কোনো বিষয় কিংবা সমাজের কোনো পরিস্থিতি নিয়ে ভাবো, যা তোমার মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। এরপর এ নিয়ে একটি গল্প রচনা করো। গল্প রচনার সময়ে কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ ইত্যাদির দিকে খেয়াল রাখো। গল্প রচনা হয়ে গেলে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সামনে উপস্থাপন করো। next page

তোমার লেখা গল্প থেকে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে দেখো—

- গল্পে কোনো কাহিনি আছে কি না?
- কাহিনিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এক বা একাধিক ঘটনা আছে কি না?
- গল্পে এক বা একাধিক চরিত্র আছে কি না?
- চরিত্রের মুখে কোনো সংলাপ আছে কি না?

## গল্প কী

গল্প গদ্য ভাষায় রচিত হয়। এর বিষয়বস্তু সাধারণ বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে থাকে। তবে, অবাস্তব ও কাল্পনিক কাহিনি নিয়েও গল্প রচিত হতে পারে। যদিও গল্পের কাহিনি সাধারণত একটু ব্যতিক্রমী হয়। গল্পের আয়তন হয় ছোটো। পরস্পর সম্পর্কিত কিছু ঘটনা নিয়ে গল্পের কাহিনি গড়ে ওঠে। কাহিনিতে কিছু চরিত্রের সমাবেশ থাকে। গল্পের ভাষা হয় বর্ণনামূলক, এতে অনেক সময়ে সংলাপের ব্যবহার হয়।

## গল্প পড়ি ১

আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক। গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবন ও সংগ্রাম তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিষয়। আবু ইসহাকের বইয়ের নাম ‘সূর্যদীঘল বাড়ি’, ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’, ‘মহাপতঙ্গ’ ইত্যাদি। নিচের গল্পটি নেওয়া হয়েছে লেখকের ‘জোঁক’ নামের গল্পগ্রন্থ থেকে।

গল্পটি প্রথমে নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে বোঝার চেষ্টা করো। এরপর সরবে পড়ো।

ছোটোগল্প:

'স্বপ্ন পূরনের ঝাড়'

'মা জানো, আমার খুব ইচ্ছে করে আকাশে পাখির মতো উড়তে। ইস। আমার যদি পাখির মতো ডানা থাকত' ছোট্ট নীড় মাকে বলছিল কথাগুলো।

মা মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'হবে তো মা, তুমি আকাশে পাখির মতো উড়বে।'

'কিন্তু কি করে মা?' বলে নীড়।

'হবে মা, বড়ো হও ভালো করে পড়াশোনা করো, ঠিক উড়বে আকাশে।'

'পাখি হতে গেলে পড়াশোনা করতে হয়? তাহলে আজ থেকে আমি ভালো করে পড়াশোনা করব।' বলে নীড়।

অনেকদিন পার হয়ে যায়। মায়ের স্নেহ ছাড়ায় ধীরে ধীরে বড়ো হয় নীড়। সে পড়াশোনায় অনেক ভালো করতে থাকে। তার বাবা নেই, তার মা-ই সব। মা বলেছেন আকাশে পাখির মতো উড়তে হলে অনেক পড়াশোনা করতে হয় তাই সে অনেক পড়াশোনা করে। নীড় একসময় স্কলারশীপ পেয়ে কানাডায় পড়তে যাওয়ার সুযোগ পায়। নীড়ের ডানা না থাকলেও উড়োজাহাজে করে ওড়ার সুযোগ তার হয়।

স্বপ্ন পূরনের লক্ষ্যে কাজ করে অবশেষে তার স্বপ্নটি বাস্তবে রূপায়িত হয়।

আমার লেখা গল্পটি থেকে যা যা বৈশিষ্ট্য পেয়েছি তা হলো-

(ক) গল্পে কাহিনি আছে।

(খ) কাহিনিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এক বা একাধিক ঘটনা রয়েছে।

(গ) গল্পে দুটি চরিত্র আছে।

(ঘ) চরিত্রের সংলাপ অনুযায়ী গল্পের কাহিনি এগিয়েছে।

# জোঁক

## আবু ইসহাক

সেদ্ধ মিষ্টি আলুর কয়েক টুকরো পেটে জামিন দেয় ওসমান। ভাতের অভাবে অন্য কিছু দিয়ে উদরপূর্তির নাম চাষি-মজুরের ভাষায় পেটে জামিন দেওয়া। চাল যখন দুর্মূল্য তখন এছাড়া উপায় কী?

ওসমান হুঁক্কা নিয়ে বসে। মাজু বিবি নিয়ে আসে রয়নার তেলের বোতল। হাতের তেলোয় ঢেলে সে স্বামীর পিঠে মালিশ করতে শুরু করে।

ছ বছরের মেয়ে টুনি জিজ্ঞেস করে, এই তেল মালিশ করলে কী অয় মা?

—পানিতে কামড়াতে পারে না। উত্তর দেয় মাজু বিবি।

—পানিতে কামড়ায়! পানির কি দাঁত আছেনি?

—আছে না আবার! ওসমান হাসে। —দাঁত না থাকলে কামড়ায় ক্যামনে?

টুনি হয়তো বিশ্বাস করত। কিন্তু মাজু বিবি বুঝিয়ে দেয় মেয়েকে—ঘাস-লতা-পাতা, কচু-ঘেঁচু পইচ্যা বিলের পানি খারাপ অইয়া যায়। অই পানি গতরে লাগলে কুটকুট করে। ওরেই কয় পানিতে কামড়ায়।

ওসমান হুঁক্কা রেখে হাঁক দেয়, কই গেলি তোতা? তামুকের ডিব্বা আর আগুনের মালশা লইয়া নায় যা। আমি আইতে আছি।

তেল নিয়ে এবার ওসমান নিজেই শুরু করে। পা থেকে গলা পর্যন্ত ভালো করে মালিশ করে। মাথায় আর মুখে মাখে সরষের তেল। তারপর কাস্তে ও হুঁক্কা নিয়ে সে নৌকায় ওঠে।

তেরো হাতি ডিঙিটাকে বেয়ে চলে দশ বছরের ছেলে তোতা। ওসমান পায়ের চটচটে তেল মালিশ করতে করতে চারদিকে চোখ বুলায়।

শ্রাবণ মাসের শেষ। বর্ষার ভরা যৌবন এখন। খামখেয়ালি বর্ষণ বৃষ্টির। আউশ ধান উঠে যাওয়ায় আমন ধানের গাছগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাদের সতেজ ডগা চিকচিক করছে ভোরের রোদে।

দেখতে দেখতে পাটখেতে এসে যায় নৌকা। পাট গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে ওসমানের চোখ তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। যেমন মোটা হয়েছে, লম্বাও হয়েছে প্রায় দুই-মানুষ সমান। তার খাটুনি সার্থক হয়েছে। সে কি যেমন-তেমন খাটুনি! রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে খেত চষো রে—ঢেলা ভাঙো রে—উড়া বাছো রে—তারপর বৃষ্টি হলে আর এক চাষ দিয়ে বীজ বোনো। পাটের চারা বড়ো হয়ে উঠলে আবার ঘাস বাছো, 'বাছট' করো। বাছট করে খাটো চিকন গাছগুলোকে তুলে না ফেললে সবগুলোই টিঙটিঙে থেকে যায়। কোষ্টায় আয় পাওয়া যায় না মোটেই।

এত পরিশ্রমের ফসল কিন্তু তার একার নয়। সে তো শুধু ভাগচাষি। জমির মালিক ওয়াজেদ চৌধুরী ঢাকায় বড়ো চাকরি করেন। দেশে গোমস্তা রেখেছেন। সে কড়ায় গন্ডায় অর্ধেক ভাগ আদায় করে নেয়। মরশুমের সময়ে তাঁর ছেলে ইউসুফ ঢাকা থেকে আসে। ধান-পাট বিক্রি করে টাকা নিয়ে আবার ঢাকা চলে যায়। গত বছর বাইনের সময়ে ও একবার এসেছিল। এসে কাগজে কাগজে টিপসই নিয়ে গেছে ভাগচাষিদের। এর আগে জমির বিলি-ব্যবস্থা মুখে মুখেই চলত।

দীর্ঘ সুপুষ্ট পাটগাছ দেখে যে আনন্দ হয়েছিল ওসমানের, তার অনেকটা নিভে যায় এসব চিন্তায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে ভাবে—আহা, তার মেহনতের ফসলে যদি আর কেউ ভাগ না বসাত!

ওসমান লুঙ্গিটা কাছা মেরে নেয়। জোঁকের ভয়ে শক্ত করেই কাছা মারতে হয়। ফাঁক পেলে জোঁক নাকি মলদ্বার দিয়ে পেটের মধ্যে গিয়ে নাড়ি কেটে দেয়।

ওসমান পানিতে নামে। পচা পানি কবরেজি পাচনের মতো দেখতে। গত দু বছরের মতো বন্যা হয়নি এবারও। তবু বুক-সমান পানি পাটখেতে। এ পাট না ডুবিয়ে কাটবার উপায় নেই।

কতগুলো পাটগাছ একত্র করে দড়ি দিয়ে বাঁধে ওসমান। ছাতার মতো যে ছাউনিটা হয় তার নিচে হুঁক্কা, তামাকের ডিব্বা, আগুনের মালসা ঝুলিয়ে রাখে সে 'টাঙনা' দিয়ে।

নৌকা থেকে কাস্তেটা তুলে নিয়ে এবার সে বলে, তুই নাও লইয়া যা গা। ইস্কুলতন তাড়াতাড়ি আইসা পড়বি।

—ইস্কুল তো চাইট্টার সময় ছুট্টি অইব।

—তুই ছুট্টি লইয়া আগে চইলা আইস।

—ছুট্টি দিতে চায় না যে মাস্টার সাব।

—কামের সময় ছুট্টি দিতে পারব না, কেমুন কথা। ছুট্টি না দিলে জিগাইস, আমার পাটগুলা জাগ দিয়া দিতে পারবনি তোগো মাস্টার।

তোতা নৌকা বেয়ে চলে যায়। ওসমান ডুবের পর ডুব দিয়ে চলে। লোহারুর দোকান থেকে সদ্য আল কাটিয়ে আনা ধারালো কাস্তে দিয়ে সে পাটের গোড়া কাটে। কিন্তু চার-পাঁচটার বেশি পাট কাটতে পারে না এক ডুবে। এক হাতা পাট কাটতে তিন-চার ডুব লেগে যায়। একের পর এক দশ-বারো ডুব দিয়ে হাঁপিয়ে ওঠা দমটাকে তাজা করবার জন্যে জিরোবার দরকার হয়। কিন্তু এই জিরোবার সময়টুকুও বৃথা নষ্ট করবার উপায় নেই। কাস্তেটা মুখ দিয়ে কামড়ে ধরে হাতা বাঁধতে হয় এ সময়ে। প্রথম দিকে দশ ডুবে তিন হাতা কেটে জিরানো দরকার হয়। কিন্তু ডুবের এই হার বেশিক্ষণ থাকে না। ক্রমে আট ডুব, ছয় ডুব, চার ডুব, দুই ডুব—এমনকি এক ডুবের পরেও জিরানো দরকার হয়ে পড়ে। অন্য দিকে ডুব-প্রতি কাটা পাটের পরিমাণও কমতে থাকে। শুরুতে যে এক হাতা পাট কাটতে তিন-চার ডুব লাগে তা কাটতে শেষের দিকে লেগে যায় সাত-আট ডুব।

পেটের জামিনের মেয়াদ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কাজ ভালোই হয়। মাঝে মাঝে ঠিকের ওপর উঠবার আগেই পেটের মধ্যের ক্ষুধা-রাক্ষস খাম খাম শুরু করে দেয়।

ওসমান আমল দেয় না প্রথম দিকে। পাট কেটেই চলে ডুব দিয়ে দিয়ে। কিন্তু আমল দিতে হয় যখন মোচড়ানি শুরু হয় নাড়িভুঁড়ির মধ্যে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, মাথা ঝিমঝিম করে, হাত-পাগুলো নিস্তেজ হয়ে আসতে থাকে।

ওসমান একবার ভাবে ঘরে যাওয়ার কথা। ডাকবে নাকি সে ছেলেকে নৌকা নিয়ে আসবার জন্যে? কিন্তু কাজ যে অর্ধেকও হয়নি এখনো। আশি হাতা পাট কাটার সংকল্প নিয়ে সে জমিতে এসেছে।

পরক্ষণেই আবার সে ভাবে—তোতা তো এখনো ইস্কুল থেকেই ফেরেনি। আর ঘরে এত সকালে রান্না হওয়ার কথাও তো নয়।

পাশেই কিছু দূরে একটা শালুক ফুল দেখতে পায় ওসমান। তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পেটে জামিন দেওয়ার এত সহজ উপায়টা মনে না থাকার জন্যে নিজের ওপর বিরক্ত হয় সে। এদিক ওদিক থেকে ডুব দিয়ে দিয়ে সে শালুক তোলে গোটা দশ-বারো। ক্ষুধার জ্বালায় বিকট গন্ধ উপেক্ষা করে কাঁচাই খেয়ে ফেলে তার কয়েকটা। বাকিগুলো মালসার আগুনে পুড়িয়ে খেয়ে নেয়।

ওসমান আবার শুরু করে—সেই ডুব দেওয়া, পাটের গোড়া কাটা, হাতা বাঁধা।

বেলা গড়িয়ে গেছে অনেকটা। প্রত্যেক ডুবের পর জিরোতে হয় এখন। পাটও একটা-দুটোর বেশি কাটা যায় না এক ডুবে। অনেকক্ষণ পানিতে থাকার দরুন শরীরে মালিশ করা তেল ধুয়ে গেছে। পানির কামড়ানি শুরু হয়ে গেছে এখন। ওসমানের মেজাজ বিগড়ে যায়। সে গালাগাল দিয়ে ওঠে, 'আমরা না খাইয়া শুকাইয়া মরি, আর এই শালার পাটগুলো মোট্টা অইছে কত। কাচিতে ধরে না। ক্যান, চিক্কন চিক্কন অইতে দোষ আছিল কি? হে অইলে এক পোচে দিতাম সাবাড় কইরা।'

ওসমান তামাক খেতে গিয়ে দেখে মালসার আগুন নিভে গেছে। কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি হয়েছিল একপশলা। পাট গাছের ছাউনি বৃষ্টি ঠেকাতে পারেনি।

ওসমান এবার ক্ষেপে যায়। গা চুলকাতে চুলকাতে সে একচোট গালাগাল ছাড়ে বৃষ্টি আর পচা পানির উদ্দেশে। তারপর হঠাৎ জমির মালিকের ওপর গিয়ে পড়ে তার রাগ। সে বিড়বিড় করে বলে, ব্যাডা তো ঢাকার শহরে ফটেং বাবু অইয়া বইসা আছে। থাবাডা দিয়া আধাডা ভাগ লইয়া যাইব। ব্যাডারে একদিন পচা পানির কামড় খাওয়াইতে পারতাম!

ওসমান আজ আর কাজ করবে না। সিদ্ধান্ত করবার সাথে সাথে সে জোরে ডাক দেয়, তোতারে—উ—

দুই ডাকের পর ওদিক থেকে সাড়া আসে, আহি—অ—

—আয়, তোর আহিডা বাইর করমু হনে।

পাটের হাতাগুলো এক জায়গায় জড় করতে করতে গজগজ করে ওসমান, আমি বুইড়্যা খাইট্যা মরি, আর ওরা একপাল আছে বইসা গিলবার।

তোতা নৌকা নিয়ে আসে। এত সকালে তার আসার কথা নয়। তবুও ওসমান ফেটে পড়ে, এতক্ষণ কী করছিলি, অ্যাঁ? তোরে না কইছিলাম ছুট্টি লইয়া আগে আইতে? ছুট্টি না দিলে পলাইয়া আইতে পারস নাই?

—আগেই আইছিলাম। মা কইছিল আর একটু দেরি কর। ভাত অইলে ফ্যানডা লইয়া যাইস।

—ফ্যান আনছস? দে দে শিগগির।

তোতা মাটির খোরাটা এগিয়ে দেয়।

লবণ মেশানো এক খোরা ফেন। ওসমান পানির মধ্যে দাঁড়িয়েই চুমুক দেয়। সবটা শেষ করে অস্ফুট স্বরে বলে, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

ফেনটুকু পাঠিয়েছে এ জন্যে স্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানায় তার অন্তরের ভাষা। এ রকম খাটুনির পর এ ফেনটুকু পেটে না দিলে সে পানি থেকে উঠতেই পারে না নৌকার ওপর। এবার আউশ ধান কাটার সময় থেকেই এ দশা হয়েছে। অথচ কতই বা আর তার বয়স! চল্লিশ হয়েছে কি হয়নি।

ওসমান পাটের হাতাগুলো তুলে ধরে। তোতা সেগুলো টেনে তোলে, নৌকায় গুনে গুনে সাজিয়ে রাখে। পাট তুলতে তুলতে ওসমান জিজ্ঞেস করে ছেলেকে, কী রানছে রে তোর মা?

—ট্যাংরা মাছ আর কলমি শাক।

—মাছ পাইল কই?

—বড়শি দিয়া ধরছিল মায়।

ওসমান খুশি হয়।

পাট সব তোলা হয়ে গেলে ওসমান নৌকায় ওঠে। নৌকার কানিতে দুই হাতের ভর রেখে অতি কষ্টে তাকে উঠতে হয়।

—তোমার পায়ে কালা উইডা কী, বাজান? তোতা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে।

—কই?

—উই যে! জোঁক না জানি কী! আঙুল দিয়ে দেখায় তোতা।

—হ, জোঁকই তো রে! এইডা আবার কোনসুম লাগল? শিগগির কাচিটা দে।

তোতা কাস্তেটা এগিয়ে দেয়। ভয়ে তার শরীরের সমস্ত রোম কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

ডান পায়ের হাঁটুর একটু ওপরেই ধরেছে জোঁকটা। প্রায় বিঘতখানেক লম্বা। করাতে জোঁক। রক্ত খেয়ে ধুমসে উঠেছে।

ওসমান কাস্তেটা জোঁকের বুকের তলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। এবার একটা শক্ত কাঠি দিয়ে জোঁকটা কাস্তের সাথে চেপে ধরে পোচ মারে পা থেকে।

—আঃ, বাঁচলাম রে! ওসমান স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

—ইস, কত রক্ত! তোতা শিউরে ওঠে।

ছেলের দিকে তাকিয়ে ওসমান তাড়া দেয়, নে এইবার লগি মার তাড়াতাড়ি।

তোতা পাট বোঝাই নৌকাটা বেয়ে নিয়ে চলে।

জোঁক হাঁটুর যেখানটায় চুমুক লাগিয়েছিল সেখান থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। সে দিকে তাকিয়ে তোতা জিজ্ঞেস করে, বাজান কেমুন কইরা জোঁক ধরল তোমারে, টের পাও নাই?

—না রে বাজান, এগুলো কেমুন কইরা যে চুমুক লাগায় কিছুই টের পাওয়া যায় না। টের পাইলে কি আর রক্ত খাইতে পারে?

—জোঁকটা কত বড়ো, বাপপুসরে—

—দুও বোকা! এইডা আর এমুন কী জোঁক। এরচে বড়ো জোঁকও আছে।

জমি থেকে পাট কেটে ফেলার পরেও ঝামেলা পোয়াতে হয় অনেক। জাগ দেওয়া, কোষ্টা ছাড়ানো, কোষ্টা ধুয়ে পরিষ্কার করা, রোদে শুকানো—এ কাজগুলো কম মেহনতের নয়।

পাট শুকাতে না শুকাতেই চৌধুরীদের গোমস্তা আসে। একজন কয়াল ও দাঁড়ি পাল্লা নিয়ে সে নৌকা ভিড়ায় ওসমানের বাড়ির ঘাটে।

বাপ-বেটায় শুকনো পাট এনে রাখে উঠানে। মেপে মেপে তিন ভাগ করে কয়াল। ওসমান ভাবে তবে কি তেভাগা আইন পাস হয়ে গেছে? তার মনে খুশি ঝলক দিয়ে ওঠে।

গোমস্তা হাঁক দেয়, কই ওসমান, দুই ভাগ আমার নায় তুইল্যা দাও।

ওসমান হাঁ করে চেয়ে থাকে।

—আরে মিয়া, চাইয়া রইছ ক্যান? যাও।

—আমারে কি এক ভাগ দিলেননি?

—হাঁ।

—ক্যান?

—ক্যান আবার! নতুন আইন আইছে জানো না? তেভাগা আইন।

—তেভাগা আইন! আমি তো হে অইলে দুই ভাগ পাইমু।

—হঁ, দিব হনে তোমারে দুই ভাগ। যাও ছোডো হুজুরের কাছে!

—হঁ, এহনই যাইমু।

—আইচ্চা যাইও যহন ইচ্ছা। এহন পাট দুই ভাগ আমার নায় তুইল্যা দিয়া কথা কও।

—না, দিমু না পাট। জিগাইয়া আহি।

—আরে আমার লগে রাগ করলে কী অইব? যদি হুজুর ফিরাইয়া দিতে কন তহন না হয় কানে আইট্যা ফিরত দিয়া যাইমু।

ওয়াজেদ চৌধুরীর ছেলে ইউসুফ বৈঠকখানার বারান্দায় বসে সিগারেট ফুঁকছে। ওসমান তার কাছে এগিয়ে যায় ভয়ে ভয়ে। তার পেছনে তোতা।

—হুজুর, ব্যাপারডা কিছু বুঝতে পারলাম না। ওসমান বলে।

—কী ব্যাপার? সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে ইউসুফ।

—হুজুর, তিন ভাগ কইরা এক ভাগ দিছে আমারে।

—হ্যাঁ, ঠিকই তো দিয়েছে।

ওসমান হাঁ করে চেয়ে থাকে।

—বুঝতে পারলে না? লাঙ্গল-গরু কেনার জন্যে টাকা নিয়েছিলে যে পাঁচশো।

ওসমান যেন আকাশ থেকে পড়ে।

—আমি টাকা নিছি? কবে নিলাম হুজুর?

—হ্যাঁ, এখন ত মনে থাকবেই না। গত বছর কাগজে টিপসই দিয়ে টাকা নিয়েছিলে, মনে পড়ে? গরু-লাঙ্গল কেনার জন্যে টাকা দিয়েছি। তাই আমরা পাব দুভাগ, তোমরা পাবে এক ভাগ। তেভাগা আইন পাস হয়ে গেলে আধা-আধা সেই আগের মতো পাবে।

—আমি টাকা নেই নাই। এই রকম জুলুম খোদাও সহ্য করব না।

—যা-যা ব্যাটা, বেরো। বেশি তেড়িবেড়ি করলে এক কড়া জমি দেবো না কোনো ব্যাটারে।

ওসমান টলতে টলতে বেরিয়ে যায় ছেলের হাত ধরে।

ইউসুফ ক্রূর হাসি হেসে বলে, তেভাগা! তে-ভাগা আইন পাস হওয়ার আগে থেকেই রিহার্সাল দিয়ে রাখছি।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে আবার সে বলে, আইন! আইন করে কি আর আমাদের আটকাতে পারে! আমরা

সুচের ফুটো দিয়ে আসি আর যাই। হোক না আইন। কিন্তু আমরা জানি, কেমন করে আইনকে 'বাইপাস' করতে হয়। হুঁহ্ হুঁ।

শেষের কথাগুলো ইউসুফের নিজের নয়। পিতার কথাগুলোই ছেলে বলে পিতার অনুকরণে।

গত বছরের কথা। প্রস্তাবিত তেভাগা আইনের খবর কাগজে পড়ে ওয়াজেদ চৌধুরী এমনি করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলেন কথাগুলো।

আইনের একটা ধারায় ছিল—'জমির মালিক লাঙ্গল-গরু সরবরাহ করিলে বা ঐ উদ্দেশ্যে টাকা দিলে উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ পাইবেন।'—এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহারের জন্যে তিনি ছেলেকে পাঠিয়ে কাগজে কাগজে টিপসই নিয়েছিলেন ভাগচাষিদের।

ফেরবার পথে তোতা জিজ্ঞেস করে, বাজান কেমুন কইরা লেইখ্যা রাখছিল? টিপ দেওনের সময় টের পাও নাই?

ছেলের প্রশ্নের উত্তর দেয় না ওসমান। একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে তার মুখ থেকে শুধু উচ্চারিত হয়—আহ্-হা-রে!

তোতা চমকে তাকায় পিতার মুখের দিকে। পিতার এমন চেহারা সে আর কখনো দেখেনি।

চৌধুরীবাড়ির সীমানা পার হতেই ওসমান দেখে—করিম গাজী, নবু খাঁ ও আরো দশ-বারো জন ভাগচাষি এদিকেই আসছে।

করিম গাজী ডাক দেয়, কী মিয়া, শেখের পো? যাও কই?

—গেছিলাম এই বড়ো বাড়ি। ওসমান উত্তর দেয়, আমারে মিয়া মাইর‍্যা ফালাইছে এক্কেরে। আমি বোলে টাকা নিছিলাম পাঁচশো।

কথা শেষ না হতেই নবু খাঁ বলে, ও, তুমিও টিপ দিছিলা কাগজে?

—হঁ ভাই, কেমুন কইরা যে কলমের খোঁচায় কী লেইখ্যা থুইছিল কিছুই টের পাই নাই। টের পাইলে কি আর এমুনডা অয়। টিপ নেওনের সময় গোমস্তা কইছিল, 'জমি বর্গা নিবা, তার একটা দলিল থাকা তো দরকার।'

—হঁ, বেবাক মাইনষেরেই এমবায় ঠকাইছে। করিম গাজী বলে, আরে মিয়া এমুন কারবারডা অইল আর তুমি ফির‍্যা চলছো?

—কী করমু তয়?

—কী করবা! খেঁকিয়ে ওঠে করিম গাজী, চলো আমাগো লগে, দেখি কী করতে পারি!

করিম গাজী তাড়া দেয়, কী মিয়া, চাইয়া রইছ ক্যান? আরে এমনেও মরছি অমনেও মরছি। একটা কিছু না কইর‍্যা ছাইড়্যা দিমু!

ওসমান তোতাকে ঠেলে দিয়ে বলে, তুই বাড়ি যা গা।

তার ঝিমিয়ে-পড়া রক্ত জেগে ওঠে। গা ঝাড়া দিয়ে সে বলে, হঁ, চলো। রক্ত চুইষ্যা খাইছে। অজম করতে দিমু না, যা থাকে কপালে।

## শব্দের অর্থ

**অজম:** হজম।

**আউশ ধান:** বর্ষাকালে পাকে এমন ধান।

**উড়া:** আগাছা বিশেষ।

**উদরপূর্তি করা:** পেট ভরে খাওয়া।

**এমবায়:** এভাবে।

**কড়ায় গন্ডায়:** নিখুঁত হিসাবে।

**কবরেজ:** কবিরাজ।

**কয়াল:** ওজন করা যার পেশা।

**কাছা:** কাপড়ের যে অংশ পায়ের ফাঁক দিয়ে কোমরের পেছনে গোঁজা হয়।

**কাস্তে:** বাঁকা দাঁতালো অস্ত্র।

**কোনসুম:** কোন সময়ে।

**কোষ্টা:** পাটের আঁশ।

**গোমস্তা:** জমিদারের কর্মচারী।

**জাগ দেওয়া:** পচানোর জন্য পানিতে ভিজিয়ে রাখা।

**টাঙনা:** যাতে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

**ডিব্বা:** কৌটা।

**ঢেলা:** শক্ত মাটির টুকরা।

**তেভাগা আইন:** ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ জমির মালিক পাবে এমন আইন।

**দুর্মূল্য:** অত্যন্ত বেশি দাম।

**পাচন:** তিতা স্বাদের তরল ওষুধ।

**বর্গা:** ফসলের ভাগ দেওয়ার শর্তে অন্যের জমি চাষ করার ব্যবস্থা।

**বাইনের সময়:** চাষের উপযুক্ত সময়।

**বাইপাস করা:** পাশ কাটিয়ে যাওয়া।

**বাছট:** বাছাই।

**বিঘত:** প্রায় নয় ইঞ্চি।

**বিলিব্যবস্থা:** ভাগ-বাঁটোয়ারা।

**ভাগচাষি:** যে চাষি ফসলের ভাগ পাওয়ার শর্তে অন্যের জমি চাষ করে।

**মরশুম:** ঋতু।

**মালসা:** মাটির পাত্র বিশেষ।

**রয়নার তেল:** রয়না গাছের বীজের তেল।

**রোম:** লোম।

**সাবাড়:** শেষ।

## ৬.২.২ গল্পের গঠন বুঝি

'জোঁক' গল্পটি ভালো করে পড়ো। তারপর নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। কাজটি প্রথমে নিজে করো এবং পরে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনে সংশোধন করো।

| | |
|---|---|
| কাহিনী কি নিয়ে | গরিব প্রজাদের শোষণ নিয়ে কাহিনী রচিত হয়েছে। |
| কি কি ঘটনা ঘটেছে? | মহাজন-প্রজার মধ্যে সম্পর্ক, ক্ষুধা-দারিদ্র্য, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত সমাজচিত্র। |

| | | |
|---|---|---|
| কোন কো | কোন কোন চরিত্র আছে? | ওসমান, মাজু, বিবি, ওয়াজেদ চৌধুরী, ইউসুফ, তোতা, টুনি, করিম, গাজী, নবুখা। |
| লেখকের | লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি কি? | লেখক মূলত সমাজের নির্যাতিত শোষিতশ্রেণির উপর শোষকের নির্যাতনের দিকটি তুলে ধরেছেন। |

## ৬.২.৩ জীবনের সাথে গল্পের সম্পর্ক খুঁজি

'জোঁক' গল্পের আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১। কৃষক ওসমানের জীবনের আনন্দ ও বেদনার কয়েকটি দিক তুলে ধরো।

উত্তর: কৃষক ওসমানের জীবনে যেমন আনন্দময় দিক আছে, তেমনি বেদনার দিকও রয়েছে। যদিও তার জীবনে আনন্দের চেয়ে বেদনার ভাগই বেশি। তার জীবনের আনন্দময় দিক হলো-

- পারিবারিকভবে ওসমান বেশি সুখী। অভাব দারিদ্রপীড়িত সংসারের মাঝেও তার স্ত্রীকে আমরা পতিপরায়না হিসেবে দেখতে পাই। সে যখন পঁচা পানিতে পাট কাটতে যায় তখন মাজুবিবি তার পিঠে তেল মালিশ করে দেয়।
- আবার ছেলে তোতার কাছে ভাতের ফেন পাঠিয়ে দেয়। অভাব দারিদ্র্যের মধ্যেও ওসমান সাংসারিক জীবনে সুখী ছিল।

অন্যদিকে তার জীবনে দুঃখের ভার ছিল প্রকট।

২। দশ বছর বয়সী তোতা তার পিতা ওসমানের সঙ্গে কাজ করে—এ ব্যাপারে তোমার মতামত কী?

উত্তর: দশ বছর বয়সি তোতা তার পিতা ওসমানের সঙ্গে কাজ করে। তোতার যে সমাজে জন্ম সেটি একটি শোষণ জর্জরিত সমাজ। ক্ষুধা, দারিদ্র-পীড়িত সমাজে ক্ষুধার অন্ন জোগাতেই পরিবার হিমশিম খায়। ফলে দারিদ্র-পীড়িত পরিবারে ছেলেমেয়ে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়। তোতা স্কুলে ভর্তি হলেও ঠিকমতো পড়তে পারে না। পিতা ওসমানকে সাংসারিক ও কৃষিকাজে সাহায্য করে। আসলে তার যেরকম পড়াশোনার সুযোগ পাওয়ার কথা ছিল তা সে পায়নি। দশ বছর বয়সি তোতা যে সমাজে বাস করে সে সমাজব্যবস্থা পাল্টাতে হবে। তবেই তার মতো শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত হবে।

৩। ‘রক্ত চুইষ্যা খাইছে। অজম করতে দিমু না, যা থাকে কপালে।’—কে কেন বলেছে ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: রক্ত চুইষ্যা খাইছে। অজম করতে দিমু না, যা থাকে কপালে।’- কথাটি বলেছে ওসমান। ওসমান ওয়াজেদ চৌধুরীর বর্গাচাষি। সে জমির ফসলের তিনভাগের দু-ভাগ পায়। একবার জমির বন্দোবস্তের কথা বলে জমির মালিক ওয়াজেদ চৌধুরী ওসমানের টিপসই নিয়ে রাখে। ফসল তোলার সময় ওয়াজেদ চৌধুরীর লোক দুই ভাগ দাবি করলে ওসমান এর কারণ জানতে চায়। মালিকপক্ষ মিথ্যা ঋনের প্রসঙ্গ এনে ওসমানের টিপসই দেখায়। এতে ওসমান ক্ষিপ্ত হয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বলে- ‘রক্ত চুইষ্যা। অজম করতে দিমু না, যা থাকে কপালে।’ ওসমানের সঙ্গে বাকি নির্যাতিত চাষিরাও যোগ দেয়।

৪। ‘জোঁক’ গল্পে লেখক সমাজের কোন বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন? এই কাহিনির সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোনো সাদৃশ্য তোমার চোখে পড়ে কি না?

উত্তর: জোঁক’ গল্পে লেখক সমাজের উচ্চশ্রেনির দ্বারা নিম্নশ্রেণির উপর শোষণ অত্যাচারের দিকটি প্রতীকী রূপে দেখাতে চেয়েছেন। এরূপ বহু শোষণ নির্যাতনের ইতিহাস আমাদের সমাজে বিদ্যমান। আমাদের গ্রামে মহাজন গ্রামের গরীব কৃষকদের সাহায্যের নামে তাদেরকে চড়া সুদে ধার দেন। পরবর্তীতে সুদের টাকা শোধ করতে করতে কৃষকদের নাজেহাল অবস্থা হয়ে যায়। এভাবে বহু কৃষক ঘরবাড়ি, ভিটামাটি বিক্রি করে মহাজনের ঋণ শোধ করতে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে।

## গল্প পড়ি ২

আনোয়ারা সৈয়দ হক (১৯৪০) একজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক। শিশুসাহিত্যিক হিসেবে তিনি সুপরিচিত। শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম 'ছানার নানাবাড়ি', 'বাবার সঙ্গে ছানা', 'ছানা ও মুক্তিযুদ্ধ' ইত্যাদি। নিচের গল্পটি তাঁর 'কত রকমের গল্প' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

গল্পটি প্রথমে নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে বোঝার চেষ্টা করো। এরপর সরবে পড়ো।

# একদিন ভোরবেলা

### আনোয়ারা সৈয়দ হক

ফাল্গুন মাস। বেশ ফুরফুরে বাতাস বইছে। ঘুম থেকে উঠে শিউলি ভাবল, এই যাঃ, আজ না আমার ফুল কুড়োতে যাবার কথা! যেমনি ভাবা, তেমনি কাজ। মুখ না ধুয়েই শিউলি একেবারে এক দৌড়ে তাদের বাড়ির বাগানে

গিয়ে হাজির। কত রকমের যে ফুল গাছ আছে তাদের বাগানে। আছে কদম, শেফালি, স্বর্ণচাঁপা; আছে রক্তকরবী, টগর, বেলফুল, গন্ধরাজ। শিউলির খুবই ভালো লাগে এই সব ফুলগাছের নিচে গিয়ে ফুল কুড়োতে। শিউলির কোনো ভাইবোন নেই, তাই বেচারি একা একাই ফুল কুড়িয়ে বেড়ায়, একা একাই ফুল দিয়ে মালা গাঁথে, খেলা করে। সে সবেমাত্র নতুন ক্লাসে উঠেছে। পড়াশোনার বেশি চাপ নেই। আর চাপ থাকলেও শিউলির পড়া শিখে ফেলতে বেশি দেরি লাগে না। ওর মাথায় খুব বুদ্ধি তো। যা পড়ে তাই মনে রাখতে পারে।

এই ভোরবেলাটা শিউলির খুব ভালো লাগে। তখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে, এমনকি শিউলির পুষি বেড়ালটা পর্যন্ত। আর চারদিকে কোনো হইচই নেই। শুধুমাত্র পাখিদের হইচই ছাড়া। শিউলি আজ হেঁটে হেঁটে একেবারে বাগানের পশ্চিম দিকে চলে গেল। এদিকে বুনো গাছগাছালির ঝোপ আর তার ভিতরে একটা ফুলে-ভরা গন্ধরাজ গাছ। অনেক ফুল সেই গাছে। শিউলি ভাবল, যাই আজ গন্ধরাজের মালা গাঁথি।

এই কথা ভাবতে ভাবতে শিউলি ঝোপের ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল; তারপর গন্ধরাজ গাছটার দিকে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। এমন সময়ে সে চমকে গিয়ে শুনতে পেল, কে যেন সরু গলায় চিৎকার করে বলছে, 'ওরে বাবা রে, মরে গেলাম রে! আমাকে বাঁচাও রে!

কথা শুনে তো ভয়ে শিউলির মাথার চুল দাঁড়িয়ে গেল। এসব আবার কী কাণ্ড! ঝোপের মধ্যে কে আবার কোথায় সাহায্য চাইছে। দরকার কি বাবা আমার এখানে থাকার, এই ভেবে শিউলি ঝোপ ছেড়ে পালিয়ে আসতে যাবে যেই, ওমনি আবার শুনতে পেল, 'ওগো মেয়ে, তুমি চলে যেও না, দয়া করে আমাকে বাঁচাও!'

শিউলি থেমে গিয়ে হতভম্বের মতো এদিকে ওদিকে চেয়ে বলল, 'তুমি কে? কোত্থেকে চিৎকার করছ?'

তখন সে শুনল, কে যেন বলছে, আমি তোমার পায়ের কাছে, ইট-পাটকেলের নিচে চাপা পড়ে আছি। আমাকে বাঁচাও।'

স্পষ্ট গলায় এই কথা শুনে শিউলি লাফিয়ে উঠে পায়ের দিকে তাকাল। দেখল, সত্যি, তার পায়ের কাছে এক গাদা আস্ত আর ভাঙা থান ইট স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। কতকগুলো থান ইট তো বেশ বড়ো আর ভারী। শিউলি উবু হয়ে বসে অনেক কষ্টে চার-পাঁচটা ইট সরাতে তার নিচ থেকে হলুদ বিবর্ণ কতকগুলো পাতা আর একটি মোটা শিকড় বেরোল। তারপর স্বরটা আবার ভেসে এল কানে।

'বাব্বাঃ, বাঁচালে! একেবারে প্রাণে মারা পড়েছিলাম আর কি। আজ তিন মাস এই ইটগুলোর নিচে। ভাগ্যিস তুমি আজ এদিকে ফুল কুড়োতে এলে। রোজই তো দেখি অন্য দিকে বসে ফুল কুড়োও, মালা গাঁথো, আমাদের এদিকে ফিরেও তাকাও না। আমি মনে মনে ভাবি, আমার মতো অসহায়ের দিকে কে বা ফিরে তাকায়!'

শিউলি অবাক হয়ে কথাগুলো শুনে মাটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

উত্তর শুনল, 'তুমি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছো না? কী দুঃখের কথা! খামোকাই আমি এতোক্ষণ কথা বললাম!'

এই কথা শুনে শিউলি থতমত খেয়ে বলল, 'আমার পায়ের কাছে কিছু হলুদ গোল পাতা আর তার মোটা একটা শিকড় ছাড়া আর কিছুই তো দেখতে পাচ্ছিনে। এটাকেই তো আমি এখন ইট সরিয়ে বের করলাম।'

শিউলির কথা শোনামাত্র, ও মা, শিউলির চোখের সামনেই শিকড়টা নড়েচড়ে বলে উঠল, 'আহা, আমাকে শিকড় বলে ডেকো না, আমি মনে দুঃখ পাব। আমি একটা গাছের চারা। আর যে সে গাছ নয়, বটগাছ। আমার ভাগ্য খারাপ, তাই পাখি এসে আমাকে এখানে বীজ অবস্থায় ফেলে গেছে। কী আর করব। কপালের গেরো, এখন ভুগতেই হবে।'

শিউলি তার কথা শুনে তাজ্জব বনে গেল! আরে গাছের শিকড় এভাবে কথা বলে নাকি? এ তো ভারি আশ্চর্য কথা! একটু ভয়ও পেল সে। কাজ কি বাবা আমার এতো ঝামেলায়, মা টের পেলে বকবে এই ভেবে সে টিপি টিপি পায়ে পালাবার উপক্রম করতেই, শিকড়টা বলে উঠল, 'আমাকে ঘেন্না করে দূরে সরে যাচ্ছ, না?' আমার চেহারা খারাপ বলে আমাকে ঘেন্না করছ? তাহলে শোনো আমার এই চেহারার জন্যে আমি দায়ী নই। দায়ী তোমাদের বাসার কাজের ছেলেটা। সে বেগম সাহেবার কথা শুনে বাগান পরিষ্কার করতে এসে প্রথমেই আমার ঘাড়ে গন্ধমাদন পর্বত চাপিয়ে দিয়েছে, অর্থাৎ ওই থান ইটগুলো। নইলে এই রকম আঁকাবাঁকা, কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো, রক্তহীন হলুদ চেহারা আমার কোনো দিন ছিল না। কিন্তু আমার প্রাণশক্তি সূর্যের আলো আর মাটির নির্যাস থেকে আমাকে বঞ্চিত করায় আজ আমার এই অবস্থা। হায়, সবই আমার ভাগ্য!'

গাছের শিকড়টার এই রকম হা-হুতাশ শুনে শিউলির মনে দুঃখ হলো। সে বলল, 'আহা, তা মন খারাপের কী আছে? এই তো আমি এখন তোমার মাথা থেকে ইট সরিয়ে দিলাম। এখন তুমি হও না দেখতে সুন্দর, হও না বড়ো, কে তোমাকে মানা করছে?'

শিউলির কথা শুনে শিকড়টা খুশি হবে কি, উলটো মাটিতে আছাড় খেলো দুবার। করুণ স্বরে বলল, 'বড়ো হতে চাইলেই কি ভাই বড়ো হওয়া যায়? বড়ো হবার পথে যে কত বাধা তা যদি তুমি জানতে। আর বড়ো হবার পরেও যে আমাদের মতো বড়ো জাতের গাছদের কত বিপদ, তা তুমি কী বুঝবে?'

শিউলি বলল, 'ও মা, তাই বলে তুমি বড়ো হবে না নাকি? যারা বড়ো হয় তারা তো সমস্ত বাধা-বিপত্তি দুপায়ে দলেই বড়ো হয়।'

তার কথা শুনে শিকড়টা বলল, 'কারা দু পায়ে বাধা দলে বড়ো হয়, সে বাপু আমি জানিনে। আমি বরং দেখেছি আমিই অন্য লোকের পায়ের নিচে পড়ে চিড়ে-চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছি। একদম বেড়ে উঠতে পারছিনে।'

শিউলি তাই শুনে তড়িঘড়ি করে বলল, 'আহা, সে তো খুব দুঃখের কথা! তোমার বয়স কত গো?'

শিকড়টা বলল, 'আমার বয়স অবশ্য খুবই কম, মাত্তর পঞ্চাশ বছর তিন দিন, তোমার চেয়েও সামান্য ছোটো আমি।'

তার কথা শুনে শিউলি চোখ কপালে তুলে বলল, 'বলো কি, কী সর্বনাশ! তুমি তো দেখি আমার বড়ো চাচার চেয়েও বড়ো, আর বলছ, তুমি আমার চেয়েও ছোটো?'

শিউলির কথা শুনে শিকড়টা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'গাছ হিসেবে আমি ছোটো না তো কী? আমাদের এক একজনের জীবনের আয়ু কত জানো? তোমাদের দশ পুরুষের চেয়েও বেশি। আমার তো সেই হিসেবে দুধের দাঁত বেরিয়েছে মাত্র। অবশ্য আমার বুদ্ধি খুব বেশি। তাই এই অল্প বয়সেই অনেক কিছু জানতে পেরেছি।'

শিউলি তার কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে এই পঞ্চাশ বছর তুমি এইখানে পড়ে আছ? আমার জন্মেরও আগে থেকে?'

তার কথা শুনে যেন মন খারাপ হয়ে গেল শিকড়টার। সে বিমর্ষ গলায় বলল, 'তাই বটে। আমার যে ভাগ্য খারাপ তা তো আগেই তোমাকে বলেছি। যদি ভাগ্য ভালো থাকত তাহলে হয়তো আজ আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম হাইকোর্টের মোড়ে, কিংবা শহিদ মিনারের পাশে। অবশ্য তা হলেও যে খুব নিরাপত্তা থাকত এ কথা জোর গলায় বলতে পারিনে। আচ্ছা বলতে পারো, তোমরা মানুষেরা এত নিষ্ঠুর কেন?'

শিউলি তার কথা শুনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলল, 'কেন, কেন?'

শিকড় বলল, 'নিষ্ঠুর নয়?' যেভাবে তোমরা আমাদের নিধন করছ, অচিরেই তো দেখি পুরো পৃথিবীটাকেই বিরান একটা এবড়ো-খেবড়ো মাঠ করে ছেড়ে দেবে। সেখানে একটা গাছ নেই, একটা পাখি নেই।'

তার কথা শুনে শিউলি ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'কেন পাখি নেই কেন?'

শিকড়টা বলল, 'পাখি কী করে থাকবে? গাছ ছাড়া কি পাখিরা বাঁচতে পারে? গাছের ডাল ছাড়া কোথায় বসে ওরা গান গাইবে, বাসা বাঁধবে?'

শিকড়টার এমন বুড়োটেপনা কথা শুনে শিউলি ঠোঁট উলটে বলল, 'ইস, তুমি বললেই হলো, না? এত গাছ পৃথিবীতে কেউ কি কেটে সাফ করতে পারে?'

শিকড়টা বলল, 'পারে না? পৃথিবীর কত বড়ো বড়ো দেশের জঙ্গল সাফ হয়ে গেছে জানো? জঙ্গল কেটে, গাছ কেটে, কী বিচ্ছিরি সব ইমারত, কলকারখানা মানুষ তৈরি করছে—তুমি তার খোঁজ রাখো? আমাদের মতো নিরীহ গাছেরা কীভাবে বড়ো হতে না হতে এই ধুলার ধরণীতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করছে তোমাদের অত্যাচারে, তার কোনো খবর রাখো?'

শিকড়টার কথা শুনে শিউলি হঠাৎ করে কেন জানি লজ্জা পেল। সে মাথা চুলকে বলল, 'সেসব তো অন্য দেশে। আমাদের এই বাংলাদেশে শুধু গাছের শোভা, পাখির কাকলি, ঝরনার গান!'

শিউলির কথা শুনে শিকড়টা হঠাৎ ফোঁস ফোঁস করে শব্দ করতে লাগল। ভয় পেয়ে শিউলি পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'ও কি, সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করছ কেন, কামড়ে দেবে নাকি?'

শিকড়টা তাই শুনে তাড়াহুড়ো করে উত্তর দিয়ে বলল, 'না, না, কামড়াব কেন, আমি কি সাপ? তোমার কথা শুনে একটু আপন মনে হেসে নিলাম আর কি! আমাদের আবার তোমাদের মতো মুখ নেই কিনা, তাই হাসিটা অমন সুন্দর আসে না। তা যাই হোক, নিজের দেশ সম্পর্কে এত উঁচু ধারণা তোমার কবে থেকে হলো বলতে পারো?'

শিউলি তার প্রশ্ন শুনে বিরক্ত হয়ে বলল, 'এ তুমি কী বলছ?'

শিকড় বলল, 'বলছি এই জন্যে যে নিজের দেশ সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই বলে। গাছগাছালি বিষয়ে তো আরো নেই। নইলে খবরের কাগজ খুললেই চোখে দেখতে পেতে কীভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, একরের পর একর জমির গাছপালা সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের সরকার আইন করেও কিছু ঠেকাতে পারছে না। যে দেশে মানুষের মনে গাছদের জন্য একটুও মায়া-মমতা নেই, সে দেশে কোন আইন এই ধ্বংসযজ্ঞ ঠেকাতে পারে?'

শিউলি এ কথা শুনে আবার মাথা চুলকে বলল, 'তা বাড়িঘর তৈরি করতে গেলে, কলকারখানা ঠিকমতো গড়তে গেলে কিছু গাছপালা তো কচুকাটা হবেই, এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে?'

শিকড় এই কথার প্রতিবাদে মুখর হয়ে আবার জোরে আছাড় খেল মাটিতে। শিউলি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আরে, করো কী, করো কী? মাথা ফেটে আমচুর হয়ে যাবে তোমার! এই দেখো, তোমার লাফানিতে তোমার মাথার একটা হলুদ পাতা খসে মাটিতে পড়ে গেল।'

'যাক খসে, মাথা ফাটলেই বা কী আসে যায়? তাই বলে কি প্রতিবাদ করব না? মাইলের পর মাইল বৃক্ষনিধন করাটাকে কি কিছু-গাছ-কাটা বলে? সে কথা না হয় ছেড়ে দাও, তোমার নিজের শহর এই ঢাকায় কোথায় কোন গাছটা বাঁচিয়ে রেখেছ বলো তো? সব কি নির্মূল করে ফেলোনি? কত পুরনো বনেদি আমাদের

প্রপিতামহদের তোমরা কি নির্বংশ করে দাওনি? আমাদের ঐতিহ্য ধ্বংস করে দাওনি? এ যেন পাকিস্তানি মিলিটারিদের অত্যাচারের মতো নির্মম! আর যারা বেঁচে আছে তাদেরও কি কম নির্যাতন করছ? তাদের গায়ে পেরেক ঠুকে, সাইনবোর্ড টাঙিয়ে, গর্ত করে, ডাল ভেঙে, তাদের গায়ের ছাল ছিঁড়ে তোমাদের নাম লিখে কম নির্যাতন করছ তোমরা?'

শিকড়টার এই অভিযোগ শুনে শিউলি অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কে জানত যে গাছপালাও মানুষের মতো চিন্তাভাবনা করতে পারে! সে একটু থেমে ভেবে নিয়ে বলল, 'তা আর কী করা যাবে বলো তো? মানুষের প্রয়োজন—'

শিউলি কথা শেষ না করতেই শিকড়টা আবার লাফিয়ে উঠল। আবার আছাড় খেলো মাটিতে, ফলে তার মাথার উপর থেকে খসে পড়ল আরো একটা হলুদ পাতা। নির্যাতিতের গলায় শিকড়টা বলে উঠল, 'তুমি আমাকে প্রয়োজনের কথা বলছ? তোপখানার মোড়ে সেই বেগুনি ফুলের শতাব্দী পুরনো গাছটাকে উপড়ে ফেলাটা তোমাদের প্রয়োজন ছিল? কীসের প্রয়োজন ছিল শুনি? একটা কৃত্রিম ঝরনা তৈরি করার প্রয়োজন ছিল? নাক হারিয়ে নরুন নিয়ে তোমরা এমন সন্তুষ্ট থাকতে পারো, তোমরা কি মানুষ হে? ছিঃ ছিঃ।'

শিউলি এ কথা শুনে থতমত খেয়ে বলল, 'মানে, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না।'

'আমি বুঝতে পারছিনে, তুমি বলো কি? আমি ঠিকই বুঝতে পারছি। এরপর যখন তোমাদের দুর্গতি হবে, আমরা খুশিতে ডুগডুগি বাজাব। এখনই বা মজাটা কেমন টের পাচ্ছ? এখন যখন বৈশাখ মাসে আকাশে গনগনে রাগী সূর্য তার রাগ ঢেলে দেয় তোমাদের মাথার ওপর, তখন তোমরা ইয়া নবসি ডাক ছেড়ে কোথায় আশ্রয় নাও? আগে যেমন দরকার হলে গাছের ছায়ায় ছায়ায় হেঁটে চলে যেতে দূরে, এখন কেমন লাগে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে? হু হু বাবা, একে বলে ওস্তাদের মার। এ মার খাবে তোমরা একেবারে শেষ রাতে।'

এই কথা শোনার পর শিউলির রাগ হয়ে গেল। শিউলি বলল, 'কেন, মার খাব কেন? আবার গাছ লাগাব। গাছ বড়ো হতে আর কতদিন?'

শিকড়টা শিউলির কথায় আবার দুবার ফোঁস ফোঁস করে উঠল। অর্থাৎ হাসল। তারপর বলল, 'সেই গাছ বড়ো হতে হতে তোমার নাতি-নাতকুড় হয়ে যাবে। সেই যে অনাদি কাল থেকে তোমরা কিছু শৌখিন গাছ লাগিয়ে রেখেছ পথের দু ধারে, কটা গাছ আদর করে তোমাদের ব্যজন করছে বলো তো?

এবার সত্যিই রেগে গেল শিউলি। ধমক দিয়ে বলল, 'তুমি তো ভারি বকবক করো দেখছি। তোমার নাম কি বকুয়া বুড়ো? আমি এই ভোরবেলা মন ভালো করে ফুল কুড়োতে এলাম, তুমি দিলে সেটা একেবারে মাটি করে। এটা কি তোমার উচিত হলো?'

তার কথা শুনে শিকড়টা চুপ করে থাকল। শিউলি জোর গলায় বলল, 'কী, কথা বলছ না যে?'

শিকড় বলল, 'ভাবছি। আসলে বাস্তবে যা ঘটছে, তা থেকে কি দূরে সরে থাকা যায় বেশি দিন, তুমিই বলো?'

শিউলি তখন বলল, 'খুব যায়। তুমি এখনো ছেলেমানুষ। মাত্তর পঞ্চাশ বছর তিন দিন হচ্ছে তোমার বয়স। এখন তোমার কাজ হচ্ছে লেখাপড়া শেখা, বড়ো হওয়া, বংশের মুখ রক্ষা করা। তোমার লেখাপড়া তো আমার মতো স্কুলে গিয়ে কষ্ট করে করতে হয় না, এখানে বসে বসেই ঝোপের ফাঁকে ফোঁকে চোখ চালিয়ে তুমি বিদ্যা অর্জন করো। প্রকৃতি হচ্ছে তোমার হেড স্যার। সকাল থেকে সন্ধে অব্দি বিদ্যা অর্জন হচ্ছে তোমার কাজ। তোমার এমনিতেই ঘিলুতে সূর্যের আলো কম লাগার জন্যে বুদ্ধি কমে যাচ্ছে, তার ওপর এতো আজেবাজে চিন্তা তোমার মাথার জন্যে খুব খারাপ, বুঝলে?'

শিকড় নাছোড়বান্দার মতো গলা মোটা করে বলল, 'বুঝলাম কিন্তু—'

শিউলিও গোঁ ধরে বলল, 'কোনো কিন্তু টিন্তু নেই। যদি তা না করো, তাহলে আবার আমি এই থান ইটটা তোমার ঘাড়ে ফেলে চলে যাব, আর কোনোদিন এদিকে আসব না। তখন বুঝবে মজা।'

শিউলির এই হুমকিতে, ও মা, ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। শিকড়টা হঠাৎ আকাশের দিকে মুখ তুলে গলা সরু করে আপন মনে বলতে লাগল—'তাইতো, আমি তো এখনো ছেলেমানুষ, মোটে পঞ্চাশ বছর তিন দিন আমার বয়স। তবু যাও বা মাথায় বড়ো হতুম, ইট চাপা পড়ে আমি বামন হয়ে গেছি! ভালো করে পাতা ছাড়তে পারিনি, পাতায় সবুজ রঙ লাগাতে পারিনি, মাটি থেকে রস শুষতেও পারিনি, কোনোরকমে উমড়ো-দুমড়ো হয়ে বেঁচে আছি। কাজ কি বাপু আমার বড়ো বড়ো কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার! এর জন্যে কেউ কি আমাকে খেতে দেবে, না পরতে দেবে? খামোকা এই অল্প বয়সে সত্যি কথা বলতে গিয়ে প্রাণটা খোয়াব নাকি? না বাপু, আমি অত বোকা নই।'

এই বলে সেই গাছের শিকড়টা সরু গলায় দুলে দুলে করুণ স্বরে গান গাইতে লাগল,

যেদিন হবে দুখের শেষ

নেচে গেয়ে

নেয়ে গেয়ে

সত্যি কথা বলব বেশ

বলব বেশ

আহা, যেদিন হবে দুখের শেষ।

শিউলি মন দিয়ে যখন গানটা শুনছে, এমন সময়ে তার কানে ভেসে এল মায়ের ডাক, 'শিউলি কোথায় তুই, ঘরে ফিরে আয় মা।'

মায়ের ডাক শুনে চমকে গেল শিউলি। ভাবল, তাই তো, কোথায় সে? এই ঝোপের ভিতরে গন্ধরাজ গাছের কাছে দাঁড়িয়ে কী সে ভাবছে? ভালো করে তাকিয়ে দেখল তার পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে পাতা-ছেঁড়া এক বটগাছের চারা। ইট চাপা পড়ে হলুদ হয়ে গেছে তার শরীর? আর কোনো দিকে কোনো শব্দ নেই। শিউলির গা কেমন শিরশির করে উঠল। 'সব আমার চোখের ভুল'—এই ভেবে এক দৌড়ে ঘরে ফিরে এল সে।

## শব্দের অর্থ

**ইমারত:** দালান।

**উপক্রম:** প্রস্তুতি।

**উমড়ো-দুমড়ো:** দুমড়ানো মোচড়ানো।

**নরুন:** নখ কাটার হাতিয়ার।

**নাছোড়বান্দা:** সহজে ছাড়তে চায় না এমন।

**প্রপিতামহ:** পিতামহের পিতা।

**বিমর্ষ:** মন-মরা।

**বুড়োটেপনা:** পাকামো।

**মাত্তর:** মাত্র।

**মিলিটারি:** সেনাবাহিনী।

**শতাব্দী:** একশো বছর।

**হাইকোর্ট:** উচ্চ আদালত।

## ৬.২.৪ গল্পের গঠন বুঝি

‘একদিন ভোরবেলা’ গল্পটি ভালো করে পড়ো। তারপর নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। কাজটি প্রথমে নিজে করো এবং পরে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনে সংশোধন করো।

| | একদিন ভোরবেলা | |
|---|---|---|
| কাহিনি কী নি | কাহিনী কি নিয়ে? | একটি ছোট্ট বটগাছের চারার সাথে শিউলি নামক এক বালিকার কাল্পনিক কথোপকথন। |
| কী কী ঘটনা | কী কী ঘটনা আছে? | শিউলির ফুল কুড়ানো, একটি বটগাছের ছোট্ট চারাকে বাঁচানোর ঘটনা (কাল্পনিক), চারাটির সাথে কথোপকথন (কাল্পনিক)। |
| কোন কোন চ | কোন কোন চরিত্র আছে? | শিউলি, শিউলির মা, বটগাছ। |
| লেখকের দৃষ্টি | লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি কী? | বৃক্ষনিধন না করে বৃক্ষকে বেড়ে উঠতে দেওয়া। |

## ৬.২.৫ জীবনের সাথে গল্পের সম্পর্ক খুঁজি

‘একদিন ভোরবেলা’ গল্পের আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১। চারাগাছের সঙ্গে শিউলি অনেক কথা বলেছে। এসব কথার ভিত্তিতে গাছের প্রতি শিউলির কী মনোভাব প্রকাশ পায় তা লেখো।

উত্তর: চারাগাছের সঙ্গে শিউলি অনেক কথা বলেছে। এসব কথার ভিত্তিতে গাছের প্রতি শিউলির যে মনোভাব প্রকাশ পায় তা হলো- গাছের প্রতি শিউলি খুবই সংবেদনশীল। বটগাছের চারাকে সবাই পায়ে মাড়িয়ে দেয় বলে বটগাছের আক্ষেপ শুনে শিউলি মনে মনে কষ্ট পায়। গাছপালাও যে মানুষের মতো চিন্তা করতে পারে এটি জেনে শিউলি খুবই আশ্চর্য হয়। শিউলি বটগাছের চারাটার দুঃখে নিজেও ব্যথিত হয়।

২। প্রকৃতিকে ধ্বংস করার যেসব ক্ষতিকর কারণ এই গল্পে রয়েছে, সেগুলো উল্লেখ করো। এছাড়া আর কী কী ভাবে প্রকৃতি ধ্বংস হয়, তার একটি তালিকা তৈরি করো।

উত্তর: প্রকৃতিকে ধ্বংস করার যেসব ক্ষতিকর কারণ এই গল্পে রয়েছে সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো-

- কোনো চারাগাছ বেড়ে ওঠার আগেই তা উপড়ে ফেলে মানুষ প্রকৃতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।
- বাড়িঘর, রাস্তাঘাট নির্মাণ করার কারণে গাছপালা কেটে ফেলা হয়।
- কলকারখানা, ইমারত তৈরি করতে বনজঙ্গল কেটে সাফ করে ফেলে।

এছাড়াও আর যে যে ভাবে প্রকৃতি ধ্বংস হয় তার একটি তালিকা তৈরি করা হলো-

- মাটিতে সার-কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে প্রকৃতি ধ্বংসের মুখে পতিত হয়।
- অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলেও প্রকৃতির উর বিরূপ প্রভাব পড়ে।
- মানুষ গাছপালা কেটে নতুন করে আর গাছ না লাগানোর ফলে প্রকৃতিতে গাছপালা কমে যায়। এভাবেও প্রকৃতি ধ্বংস হয়।

৩। তোমার বাড়ি বা এলাকায় গাছপালা বৃদ্ধি করা ও রক্ষা করার জন্য তুমি এবং তোমার সহপাঠীরা কোন ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারো?

উত্তর: আমাদের বাড়ি বা এলাকায় গাছপালা বৃদ্ধি করা ও রক্ষা করার জন্য আমরা বা আমাদের সহপাঠীদের যে ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারি তা নিচে উল্লেখ করা হলো-

- বাড়ির আশেপাশে পরিকল্পিতভাবে গাছপালা লাগাতে পারি।
- রাস্তার দুধারে গাছ লাগিয়ে গাছপালা বৃদ্ধি করে পরিবেশবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি।
- গ্রাম/মহল্লার সাধারণ জনগণকে বৃক্ষরোপণে উদবুদ্ধ করতে হবে। তাদেরকে বৃক্ষরোপণের উপকারিতা এবং বৃক্ষনিধনের অপকারিতা সম্পর্কে জানাতে হবে।
- কোনো কারণে গাছ কাটা হলেও কর্তনকৃত গাছের বিপরীতে আরও বেশি করে গাছ লাগাতে হবে।

এভাবে আমরা বাড়ি বা এলাকায় গাছপালা বৃদ্ধি ও রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারি।

## গল্প পড়ি ৩

লীলা মজুমদার (১৯০৮-২০০৭) বাংলা ভাষার একজন বিশিষ্ট লেখক। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও তিনি লিখেছেন প্রবন্ধ, নাটক ও আত্মজীবনী। শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম 'হলদে পাখির পালক', 'দিনদুপুরে', 'বদ্যিনাথের বড়ি' ইত্যাদি। নিচে 'পাখি' নামে তাঁর একটি গল্প দেওয়া হলো।

গল্পটি প্রথমে নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে বোঝার চেষ্টা করো। এরপর সরবে পড়ো।

# পাখি

### লীলা মজুমদার

ডান পা-টা মাটি থেকে এক বিঘত ওঠে, তার বেশি ওঠে না। কুমু তাহলে চলে কী করে?

মাসিরা মাকে বললেন—"কিচ্ছু ভাবিসনে, রোগ তো সেরেই গেছে, এখন ওকে ঝাড়া তিন মাস সোনাঝুরিতে মার কাছে রেখে দে, দেখিস কেমন চাঙ্গা হয়ে উঠবে।"

বাবাও তাই বললেন, “বাঃ, তবে আর ভাবনা কী, কুমু? তাছাড়া ওখানে ওই লাটু বলে মজার ছেলেটা আছে, হেসে খেলে তোর দিন কেটে যাবে।”

কিন্তু পড়া? কুমু যে পড়ায় বড়ো ভালো ছিল। তা তিন মাস গেছে শুয়ে শুয়ে, তিন মাস গেছে পায়ে লোহার ফ্রেম বেঁধে হাঁটতে শিখে। আরও তিন মাস যদি যায় দিদিমার বাড়িতে, তবে পড়া সব ভুলে যাবে না?

মা বললেন, “পড়ার জন্য অত ভাবনা কীসের? লাটুর বাড়ির মাস্টার তোমাকেও পড়াবেন।”

মাসিরা বললেন, “বেঁচে উঠেছিস এই যথেষ্ট, তা না হয় একটা বছর ক্ষতিই হলো, তাতে কী এমন অসুবিধেটা হবে শুনি?”

হাসি, রত্না সবাই ওপরের ক্লাসে উঠে যাবে, কুমু পড়ে থাকবে, ভাবলেও কান্না পায়। কুমুর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

সোনাঝুরিতে দিদিমার বাড়ির দোতালার বড়ো ঘরে, মস্ত জানালার ধারে আরামচেয়ারে বসে বসে চেয়ে দেখে দূরে একটা বিল, সেখানে হাজার হাজার বৃষ্টির জলের ফোঁটা পড়ছে আর অমনি বিলের জলে মিশে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে পা-টা আবার একটু তুলতে চেষ্টা করে কুমু।

সন্ধে হয়ে আসছে, বৃষ্টি থেমে গেছে, বিলের জল সাদা চকচক করছে।

আকাশ থেকে হঠাৎ ছায়ার মতো কী বিলের ওপর নেমে এল। কুমু দেখে ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা ফিকে ছাই রঙের বুনো হাঁস ঝুপঝাপ করে জলে নামছে।

এক ছড়া কী যেন সাদা ফুল হাতে নিয়ে লাটু এসে বলল, “ওই দেখ, বুনো হাঁসরা আবার এসেছে। শিকারিদের কী মজা! ইস, আমার যদি একটা এয়ারগান থাকত।”

কুমু বলল, “বন্দুক নেই ভালোই হয়েছে। অমন সুন্দর পাখিও মারতে ইচ্ছে করে!”

দিদিমাও তখন ঘরে এসে বললেন, “হ্যাঁ, ওদের ওই এক চিন্তা!”

কুমু বলল, “কোত্থেকে এসেছে ওরা?”

“যেই শীত পড়ে অমনি উত্তরের ঠান্ডা দেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে, বাঁধের কাছে দু-তিন দিন বিশ্রাম করে, তারপর আবার দক্ষিণ দিকে উড়ে যায়, শোনা যায় নাকি সমুদ্রের ওপর দিয়ে আন্দামান অবধি উড়ে যায় কেউ কেউ।”

লাটু কাছে এসে ফুলটা কুমুর খাটে রেখে বলল—“আবার শীতের শেষে ঝাঁকে ঝাঁকে সব ফিরে আসে, সে কথা তো বললে না ঠাকুরমা?”

লাটুর কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দূরে দুম দুম করে বন্দুকের গুলির শব্দ হলো, আর বুনো হাঁসের ঝাঁক জল ছেড়ে আকাশে উড়ে খুব খানিকটা ডাকাডাকি করে আবার জলে নামল।

পরদিন সকালে জানালা খুলে, পর্দা টেনে দিদিমা চলে গেলে, কুমু জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে লেবুগাছের পাতার

আড়ালে, ডাল ঘেষে কোনোমতে আঁকড়ে-পাকড়ে বসে রয়েছে ছোটো একটা ছাই রঙের বুনো হাঁস। সরু লম্বা ঠোঁট দুটো একটু হাঁ করে রয়েছে, পা দুটো একসঙ্গে জড়ো করা, বুকের রংটা প্রায় সাদা, চোখ দুটো একবারে কুমুর চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে, কালো মখমলের মতো দুটো চোখ। একদিকের ডানা একটু ঝুলে রয়েছে, খানিকটা রক্ত জমে রয়েছে, সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে।

পাখিটাকে দেখে কুমুর গলার ভেতরে টনটন করতে থাকে; হাত বাড়িয়ে বলে, "তোমার কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই।" পাখিটা চোখ বন্ধ করে, আবার খোলে। আর একটু ডাল ঘেঁষে বসে।

লাটু কুমুর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে পাখিটাকে দেখতে পায়। ইস! ডানায় গুলি লেগেছে বেচারার। চুন হলুদ দিয়ে বেঁধে দিলে সেরেও যেতে পারে। বলিস তো ধরে আনি।"

কুমু বলল, "কিন্তু দিদিমা কী বলবেন?"

"কী আবার বলবেন? বলবেন ছি ছি ছি, নোংরা জিনিস ফেলে দে, ওসব কি বাঁচে!"

কুমু জোর গলায় বলল, "নিশ্চয় বাঁচে, চুন হলুদ দিয়ে ডানা বেঁধে, গরম জায়গায় রাখলে নিশ্চয় বাঁচে।"

লাটু বলল, "কোন গরম জায়গায়?"

"কেন আমার বিছানায়, লেপের মধ্যে।"

"দেখিস, কেউ যেন টের না পায়।"

"কী করে টের পাবে, আমার বিছানা তো আমি নিজে করি। ডাক্তার আমাকে হাত-পা চালাতে বলছে যে। আচ্ছা ধরতে গেলে উড়ে পালাবে না তো?"

"তোর যেমন বুদ্ধি। এক ডানায় ওড়া যায় নাকি?"

"কী খাবে ও, লাটু?"

লাটু ভেবে পায় না খাটের মধ্যে বিছানার ভিতরে কী খাওয়াবে ওকে। না খেয়ে যদি মরে যায়!

"এক কাজ করলে হয় না রে কুমু? ঝুড়ি দিয়ে, লেবুগাছের ডালে ওর জন্য একটা বাসা বেঁধে দিই, তাহলে ভাঙা ডানা নিয়ে আর পড়ে যাবে না, নিজেই পোকামাকড় ধরে খাবে।"

নিমেষের মধ্যে ঝুড়ি নিয়ে লাটু জানালা গলে একেবারে লেবু গাছের ডালে। ভয়ের চোটে পাখিটা পড়ে যায় আর কী! লাটু তাকে খপ করে ধরে ফেলে, কিন্তু কী তার ডানা ঝাপটানি, ঠুকরে ঠুকরে লাটুর হাত থেকে রক্ত বের করে দিল। লাটু দড়ি দিয়ে শক্ত করে ঝুড়ি বেঁধে পাখিটাকে আস্তে আস্তে তার মধ্যে বসিয়ে দিল। অমনি পাখিটা আধমরার মতো চোখ বুজে ভালো ডানাটার মধ্যে ঠোঁট গুঁজে দিল।

লাটু সে জায়গাটাতে নিজের পা কাটার সময়কার হলদে মলম লাগিয়ে দিয়ে আবার জানালা গলে ঘরে এল। বলল, "ঠাকুরমার কাছে যেন আবার বলিস না। বলবেন হয়তো, ছুঁস না ওটাকে।"

কুমু হাঁটতে পারে না ভালো করে, পাখিটাও উড়তে পারে না। পারলে নিশ্চয় ওই দূরে বিলে ওর বন্ধুদের কাছে চলে যেত। গাছের ডালে ঝুড়িতে ডানায় মুখ গুঁজে চুপ করে পড়ে থাকত না। কুমুর পা ভালো হলে কুমুও এখানে থাকত না। মার কাছে থাকত, রোজ ইস্কুলে যেত, সন্ধ্যাবেলায় সাঁতার শিখত, দৌড় খেলার জন্য রোজ অভ্যাস করত। আর কোনোদিনও হয়তো কুমু দৌড়াতে পারবে না। কিছুতেই আর পায়ে জোর পায় না, মাটি থেকে ওই এক বিঘতের বেশি তুলতে পারে না। মনে হয় অন্য পা-টার চেয়ে একটা একটু ছোটো হয়ে গেছে।

আর একবার জানালার কাছে গিয়ে পাখিটাকে দেখে ভালো করে, ও ডানাটাকে যে নাড়া যায় না সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। পাখিটা ঝুড়িতে বসে আস্তে আস্তে কালো ঠোঁট দিয়ে বুকের পালক পরিষ্কার করছে। তারপর কিছুক্ষণ ঠোঁটে ভর দিয়ে চুপ করে চোখ বুঁজে পড়ে থাকল; তারপর আবার চোখ খুলে গাছের ডাল থেকে কী একটা খুঁটে খেলো।

কুমু বালিশের তলা থেকে ছোট্ট বিস্কুটের বাক্স থেকে একটুখানি বিস্কুট ছুড়ে দিল। পাখিটাও অমনি যেন পাথর হয়ে জমে গেল। বিস্কুটের দিকে ফিরেও চাইল না। কুমু আবার খাটে এসে বসল, নতুন গল্পের বইটা পড়তে চেষ্টা করল। পনেরো মিনিট বাদে আর একবার জানালা দিয়ে উঁকি মারল। বুকের পালক পরিষ্কার করতে করতে পাখিটা আবার কী একটা খুঁটে খেলো।

গাছের ডালে পাখিটা একটু নড়ছে, একটু শব্দ হচ্ছে, কুমু ভয়ে কাঠ, এই বুঝি দিদিমা দেখতে পেয়ে মঙ্গলকে বলেন, “ফেলে দে ওটাকে, বড়ো নোংরা, ঝুড়ি খুলে আন, ওটা কে বেঁধেছে ওখানে?”

কুমু জানলা দিয়ে চেয়ে দেখে পাখিটা ঘুমিয়ে আছে। কুমুও বই নিয়ে বিছানায় গিয়ে শুলো। হঠাৎ জানালার বাইরে শোরগোল। চমকে উঠে দেখে একটা হলদে বেড়াল গাছের ডালে গিয়ে উঠেছে। কুমু ভয়ে কাঠ; এই বুঝি বেড়াল পাখিটা খেলো। কিন্তু খাবে কী, অত বড়ো পাখি তার তেজ কত! দিলো ঠুকরে ঠেলে ভাগিয়ে। দুটো কাক দূর থেকে মজা দেখল, কাছে ঘেঁষতে সাহস পেল না।

কুমু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এ মাথা থেকে ও মাথা হেঁটে বেড়াতে লাগল, খোঁড়া হয়েছে তো কী, এই রকম করে হাঁটলেই না পায়ের জোর বাড়বে। দুবার হেঁটে কুমু এসে যখন খাটে বসল, পা দুটোতে ব্যথা ধরে গেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন ডান পা-টা এক বিঘতের চেয়ে একটু বেশিই তোলা যাচ্ছে।

এমনি করে দিন যায়, বুনো হাঁসের ডানা আস্তে আস্তে সারতে থাকে। দুদিন পরে পাখির ঝাঁক বিল থেকে দক্ষিণ দিকে উড়ে গেল। গাছের ডালে বসে পাখিটা একটা ডানা ঝাপটাতে লাগল। উড়বার জন্য কী যে তার চেষ্টা! কিন্তু ভাঙা ডানা ভর সইবে কেন, হাঁসটা ঝুড়ি থেকে পিছলে পড়ে নিচের ডালের ফাঁকে আটকে থাকল। লাটু তখনও স্কুল থেকে ফেরেনি, কুমু করে কী! জানলার ধারে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকল, পাখিটা অনেকক্ষণ অসাড় হয়ে ঝুলে থাকার পর আঁচড়ে-পাঁচড়ে নিজেই সেই ডালটার ওপর চড়ে বসল। লাটু ফিরে এসে আবার ওকে তুলে ঝুড়িতে বসিয়ে দিল। ঠোকরালোও একটু সে, তবে তেমন কিছু নয়, ডানায় আবার ওষুধ লাগিয়ে দিল লাটু।

এমনি করে দিন যায়, রোজ পাখিটা একটু করে সেরে ওঠে, ঝুড়ি থেকে ডালে নামে। আর আনন্দের চোটে কুমুও ঘরময় হেঁটে বেড়ায়, নিজের বিছানা নিজে পাতে, নিজে স্নান করে, জামা কাচে। দুপুরবেলা এক ঘুম দিয়ে উঠে

নিজে বসে অঙ্ক কষে। বাড়িতে চিঠি লেখে, “মা বাবা, তোমরা ভেব না, আমি রোজ রোজ সেরে উঠছি, রত্নাদের বলো আমি পরীক্ষা দেবো।”

এমনি করে একমাস কাটল। তার মধ্যে একদিন খুব বৃষ্টি হয়েছিল। পাখিটা ঝুড়ির তলার গাছের ডালের আড়ালে গিয়ে লুকাল। তারপর বৃষ্টি থেমে আবার যখন রোদ উঠল, পাখিটা দিব্যি ডানা মেলে পালক শুকাল। কুমু অবাক হয়ে দেখল ডানা সেরে গেছে।

তার দুদিন পরে দুপুরে মাথার অনেক ওপর দিয়ে মস্ত এক ঝাঁক বুনো হাঁস তিরের মতো নকশা করে উড়ে গেল। কুমুর পাখিও হঠাৎ কী মনে করে ডাল ছেড়ে অনেকখানি উঁচুতে উড়ে গেল, কিন্তু তখনি আবার নেমে মগডালে বসল। হাঁসরাও নামল। পাখিটা সেই দিকেই চেয়ে থাকল।

সারা রাত বুনো হাঁসরা বিশ্রাম করে পরদিন সকালে যখন দল বেঁধে আকাশে উড়ল, কুমুর পাখিও তাদের সঙ্গ নিল। দল থেকে অনেকটা পিছিয়ে থাকল বটে, কিন্তু ক্রমাগত যে রকম উড়তে লাগল, কুমু লাটুর মনে কোনো সন্দেহ রইল না, এখনি ওদের ধরে ফেলবে।

সে বিকেলে কুমু নিজে হেঁটে নিচে নামল, ডান পা-টা যেন একটু ছোটোই মনে হলো।

কুমু বলল, “দিম্মা, পা-টা একটু ছোটো হলেও কিছু হবে না, আমি বেশ ভালো চলতে পারি। বুনো হাঁসটারও একটা ডানা একটু ছোটো হয়ে গেছে।’’

শুনে দিদিমা তো অবাক! তখন লাটু আর কুমু দুজনে মিলে দিদিমাকে পাখির গল্প বলল। দিদিমা কুমুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, “ওমা, বলিসনি কেন, আমিও যে পাখি ভালোবাসি।”

(সংক্ষেপিত)

## শব্দের অর্থ

**অসাড়:** অচেতন।

**আঁচড়ে-পাঁচড়ে:** অনেক চেষ্টা করে।

**আন্দামান:** ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ।

**এক ছড়া:** এক গুচ্ছ।

**একদৃষ্টে:** এক দৃষ্টিতে; চোখের পলক না ফেলে।

**চাঙ্গা:** ফুরফুরে।

**ফিকে:** ধূসর।

**মগডাল:** উপরের ডাল।

## ৬.২.৬ গল্পের গঠন বুঝি

‘পাখি’ গল্পটি ভালো করে পড়ো। তারপর নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। কাজটি প্রথমে নিজে করো এবং পরে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনে সংশোধন করো।

| | |
|---|---|
| কাহিনি কী নিয়ে? | |
| কাহিনী কি নিয়ে? | পাখির প্রতি মানুষের মমত্ববোধ। |
| কী কি ঘটনা ঘটেছে? | অসুস্থ কুমুর দিদিমার বাড়ি যাওয়া, একটি আহত বুনোহাঁসকে কুমু ও লাটুর সারিয়ে তোলা, কুমুর পা ভালো হয়ে যাওয়া। |
| কোন কোন চরিত্র আছে? | কুমু, লাটু, দিদিমা। |
| লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি কি? | লেখক মূলত মানুষের সঙ্গে পশুপাখির সৌহার্দতা তুলে ধরেছেন এ গল্পে। |
| লেখকের দৃষ্টভাঙ্গি কা? | |

## ৬.২.৭ জীবনের সাথে গল্পের সম্পর্ক খুঁজি

‘পাখি’ গল্পের আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১। ‘পাখি’ গল্পে পাখির প্রতি কুমুর কী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?

উত্তর: ‘পাখি’ গল্পে পাখির প্রতি কুমুর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। কুমু তার দিদিমার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে একটি বুনোহাঁসের প্রতি মমত্ববোধ অনুভব করে। একটি আহত হাঁসের সেবা-শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলে। এক শিকারির বন্দুকের গুলিতে বুনোহাঁসটির একদিকের ডানা ঝরে যায় এবং তাতে রক্ত জমে যায়। পাখিটিকে দেখে কুমুর গলার ভিতরে টনটন করতে থাকে। সে পাখিটির আহত স্থানে চুন হলুদ দিয়ে বেঁধে দেয়। কুমুর সেবাযত্ন পেয়ে পাখিটি সুস্থ হয়ে ওঠে এবং মুক্ত আকাশে উড়তে পারে। ‘পাখি’ গল্পে মূলত পাখির প্রতি কুমুর অসাধারণ মানবিকতাবোধ ফুটে উঠেছে।

২। কুমু ও পাখির মধ্যে লেখক কী মিল দেখিয়েছেন?

উত্তর: কুমু ও পাখির মধ্যে অনেকগুলো মিল রয়েছে। কুমু ডান পা-টা মাটি থেকে বেশি উপরে উঠাতে পারে না। অন্যদিকে পাখিটির একদিকের ডানাও একটু ঝুলে রক্তজমাট বেঁধে রয়েছে। এক শিকারি বন্দুক দিয়ে পাখিটিকে গুলি করার ফলে পাখিটি আহত হয়। এই আহত পাখিটিকে যে কুমু নামের মেয়েটি সেবা করেছে সে-ও আহত। কুমুর পা-টা ভালো হয়ে গেলেও একটু খাটো হয়ে যায়। আবার বুনো হাঁসটারও একটা ডানা একটু ছোটো হয়ে যায়। কুমুর পা একটু ছোটো হয়ে গেলেও সে বেশ ভালো চলতে পারে। বুনোহাঁসটিও একটা ডানা ছোটো হয়ে গেলেও মুক্ত আকাশে উড়তে পারে। এভাবে লেখক কুমু ও পাখির মধ্যে মিল দেখিয়েছেন।

৩। শীতকালে বিভিন্ন ধরনের অতিথি পাখি বাংলাদেশে আসে। এসব পাখি শিকার করাকে কি তুমি সমর্থন করো? কেন করো অথবা কেন করো না?

উত্তর: শীতকালে বিভিন্ন ধরনের অতিথি পাখি বাংলাদেশে আসে। এসব পাখি শিকার করাকে আমি সমর্থন করি না। প্রতিবছর শীতকালে আমাদের দেশে নাম না জানা রং বেরঙের অনেক পাখি আসে। নদীনালা, বিল, হাওর, জলাশয়, পুকুর ভরে যায় এসব পাখিতে। আদর করে আমরা ওদের বলি অতিথি পাখি। এসব পাখি দূর দেশ থেকে আমাদের দেশে আসে প্রাণ বাঁচাতে। বরফ শুভ্র হিমালয় এবং হিমালয়ের ওপাশ থেকেই বেশিরভাগ অতিথি পাখির আগমন ঘটে। পাখিগুলো যেসব দেশ থেকে আসে সেখানে প্রচন্ড শীত থাকে। ফলে এরা তা সহ্য করতে পারে না। আর এ জন্যই অন্য দেশে চলে আসে। তাছাড়া এ সময়টাতে শীতপ্রধান এলাকায় খাবারেরও প্রচন্ড অভাব দেখা যায়। পাখিগুলো আশ্রয়ের আশায় আমাদের দেশে এসেছে তাই এসব অতিথি পাখিদের শিকার না করে এদের যথাযথ সুরক্ষার পরিবেশ তৈরি করা উচিত বলে আমি মনে করি। এ কারণে আমি অতিথি পাখি শিকার করা সমর্থন করি না।

## গল্প পড়ি ৪

জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২) একজন কথাসাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র-নির্মাতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম 'হাজার বছর ধরে', 'বরফ গলা নদী', 'আরেক ফাল্গুন', 'কয়েকটি সংলাপ' ইত্যাদি। 'জীবন থেকে নেয়া' তাঁর একটি বিখ্যাত চলচ্চিত্র। নিচের গল্পটি জহির রায়হানের 'সময়ের প্রয়োজনে' গল্পগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

গল্পটি প্রথমে নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে বোঝার চেষ্টা করো। এরপর সরবে পড়ো।

# সময়ের প্রয়োজনে

### জহির রায়হান

কিছুদিন আগে সংবাদ সংগ্রহের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের একটা অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে গিয়েছিলাম। ক্যাম্প-কমান্ডার ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন। সেই ব্যস্ততার মুহূর্তে আমার দিকে একটা খাতা এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি বসুন। এই খাতাটা পড়ুন বসে বসে। আমি কয়েকটা কাজ সেরে নিই। এরপর আপনার সঙ্গে আলাপ করব।

খাতাটা হাত বাড়িয়ে নিলাম।

লাল মলাটে বাঁধানো একটা খাতা। ধুলো, কালি আর তেলের কালচে দাগে ময়লা হয়ে গেছে এখানে ওখানে।

খাতাটা খুললাম।

গোটা গোটা হাতে লেখা। মাঝেমধ্যে একটু এলোমেলো।

আমি পড়তে শুরু করলাম।

প্রথম প্রথম কাউকে মরতে দেখলে ব্যথা পেতাম। কেমন যেন একটু দুর্বল হয়ে পড়তাম। কখনো চোখের কোণে একফোঁটা অশ্রু হয়তো জন্ম নিত। এখন অনেকটা সহজ হয়ে গেছি। কী জানি, হয়তো অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে, তাই। মৃত্যুর খবর আসে। মরা মানুষ দেখি। মৃতদেহ কবরে নামাই। পরক্ষণে ভুলে যাই।

রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিয়ে ছোট্ট টিলাটার ওপরে এসে দাঁড়াই। সামনে তাকাই। বিরাট আকাশ। একটা লাউয়ের মাচা। কচি লাউ ঝুলছে। বাতাসে মৃদু দুলছে। কয়েকটা ধানখেত। দুটো তালগাছ। দূরে আরেকটা গ্রাম। খবর এসেছে ওখানে ঘাঁটি পেতেছে ওরা। একদিন যারা আমাদের অংশ ছিল। একসঙ্গে থেকেছি। শুয়েছি। খেয়েছি। ঘুমিয়েছি। এক টেবিলে বসে গল্প করেছি। প্রয়োজনবোধে ঝগড়া করেছি। ভালোবেসেছি। আজ তাদের দেখলে শরীরের রক্ত গরম হয়ে যায়। চোখ জ্বালা করে ওঠে। হাত নিশপিশ করে। পাগলের মতো গুলি ছুড়ি। মারার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠি। একজনকে মারতে পারলে উল্লাসে ফেটে পড়ি। ঘৃণার থুতু ছিটাই মৃতদেহের মুখে।

সামনে ধানখেত। আলের উপরে কয়েকটা গরু। একটা ছাগল। একটানা ডাকছে। একঝাঁক পাখি উড়ে চলে গেল দূরে গ্রামের দিকে। কী যেন নড়েচড়ে উঠল সেখানে। মুহূর্তে দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। ক্যাম্প-কমান্ডারকে খবর দিলাম।

স্যার, মনে হচ্ছে ওরা এগোতে পারে।

তিনি একটা ম্যাপের ওপরে ঝুঁকে পড়ে হিসাব কষছিলেন। মুখ তুলে তাকালেন। একজোড়া লাল চোখ। গত দু-রাত ঘুমোননি। অবকাশ পাননি বলে। তিনি তাকালেন। বললেন, কী দেখেছ?

বললাম, মনে হলো একটা মুভমেন্ট।

ভুল দেখেছ। আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন তিনি। ওদের দু-একদিনের মধ্যে এগোবার কথা নয়। যাও ভালো করে দেখো।

চলে এলাম নিজের জায়গায়। একটানা তাকিয়ে থাকি। মাঝেমধ্যে তন্দ্রা এসে যায়। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। হয়তো তাই ভুল দেখি।

কিন্তু বুড়িগঙ্গার পাশে লঞ্চঘাটের অপরিসর বিশ্রামাগারে যে দৃশ্য দেখেছিলাম, সেটা ভুল হওয়ার নয়। শুনেছিলাম, বহু লোক আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে। যখন গেলাম, দেখলাম কেউ নেই।

দেখলাম।

মেঝেতে পুডিংয়ের মতো জমাট রক্ত।

বুটের দাগ।

অনেক খালি পায়ের ছাপ।

ছোটো পা। বড়ো পা। কচি পা।

কতগুলো মেয়ের চুল।

দুটো হাতের আঙুল।

একটা আংটি।

চাপ চাপ রক্ত।

কালো রক্ত। লাল রক্ত।

মানুষের হাত। পা। পায়ের গোড়ালি।

পুডিংয়ের মতো রক্ত।

খুলির একটা টুকরো অংশ।

এক খাবলা মগজ।

রক্তের ওপরে পিছলে-যাওয়া পায়ের ছাপ।

অনেক ছোটো-বড়ো ধারা। রক্তের ধারা।

একটা চিঠি।

মানিব্যাগ।

গামছা।

একপাটি চটি।

কয়েকটি বিস্কুট।

জমে থাকা রক্ত।

একটা নাকের নোলক।

একটি চিরুনি।

বুটের দাগ।

লাল হয়ে যাওয়া একটা সাদা ফিতে।

চুলের কাঁটা।

দেশলাইয়ের কাঠি।

একটা মানুষকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ছাপ।

রক্তের মাঝখানে এখানে ওখানে অনেকগুলো ছড়ানো।

পাশের নর্দমাটা বন্ধ।

রক্তের স্রোত লাভার মতো জমে গেছে সেখানে।

দেখছিলাম।

দেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছিলাম সেখান থেকে।

আমি একা নই। অসংখ্য মানুষ।

অসংখ্য মানুষ পিঁপড়ের মতো ছুটছিল।

মাথায় সুটকেস, বগলে কাপড়ের গাঁটরি। হাতে হারিকেন। কোমরে বাচ্চা।

চোখেমুখে কী এক অস্থির আতঙ্ক।

কথা নেই। মৌন সবাই।

সহসা কে যেন বলল, ওদিকে যাবেন না। মিলিটারি। নৌকায় করে করে লোকজন সব ওপারে পালাচ্ছিল। মিলিটারি ওদের ওপরে গুলি করেছে। দু-তিনশো লোক মারা গেছে ওখানে। যাবেন না।

মনে হলো পায়ের সঙ্গে যেন কয়েক মন পাথর বেঁধে দিয়েছে কেউ।

একা নই। অসংখ্য মানুষ। সহস্র চোখ। হতবিহ্বল মুহূর্ত। কোন দিকে যাব। পেছনে ফিরে যাওয়ার পথ নেই। মৃতদেহের স্তূপের নিচে সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

সামনে এগিয়ে যাব। ভরসা পাচ্ছিনে। সেখানেও হয়তো মৃতের পাহাড় পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

কোনদিকে যাব?

পরমুহূর্তে একটা হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেলাম। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছুটতে লাগলাম আমরা। যে যেদিকে পারছে ছুটছে। কাঁচকি মাছের মতো চারপাশে ছিটকে যাচ্ছে সবাই।

হেলিকপ্টার মাথার ওপরে নেমে এলো।

তারপর।

তারপর মনে হলো একসঙ্গে যেন অনেকগুলো বাজ পড়ল। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শুধু অনেকগুলো শব্দের তাণ্ডব। মেশিনগানের শব্দ। বাচ্চাদের কান্না। কতগুলো মানুষের আর্তনাদ। কাতরোক্তি। কয়েকটা কুকুরের চিৎকার। কান্না। মেশিনগানের শব্দ। মানুষের বিলাপ। একটি কিশোরের কণ্ঠস্বর। বাজান। বাজান। হারিয়ে যাওয়া বাবাকে ডাকছে সে। বাজান। বাজান। তারপর শ্মশানের নীরবতা। ঘাড়ের কাছে চিনচিনে একটা ব্যথা। ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালাম। দেখলাম। না, কিছুই দেখতে পেলাম না। সবকিছু ঝাপসা হয়ে এল। মনে হলো চারপাশে অন্ধকার নেমে আসছে। বুঝতে পারলাম জ্ঞান হারাচ্ছি। কিংবা মারা যাচ্ছি।

সামনে ধানখেত। একটা লাউয়ের মাচা। কচি লাউ ঝুলছে। পেছনে কয়েকটা বাঁশবন। আড়ালে চার-পাঁচটা তাঁবু। একটা পুরনো দালান। ওখানে আমরা থাকি।

মোট সাতাশ জন মানুষ।

প্রথম উনিশ জন ছিলাম। আট জন মারা গেল মর্টারের গুলিতে। ওদের নামিয়ে দিয়ে যখন ক্যাম্পে ফিরলাম, তখন আমরা এগারো জন।

একজন পালিয়ে গেল সে রাতে। গেল, আর এল না। আর একজন মারা গেল হঠাৎ অসুখ করে। কী অসুখ বুঝে ওঠার আগেই হাত-পা টান টান করে শুয়ে পড়ল সে। আর উঠল না। তার বুকপকেটে একটা চিঠি পেয়েছিলাম। মায়ের কাছে লেখা। মা। আমার জন্য তুমি একটুও চিন্তা কোরো না, মা। আমি ভালো আছি।

চিঠিটা ওর কবরে দিয়ে দিয়েছি। থাকো। ওখানেই থাকো। তখন ছিলাম ন জন। এখন আবার বেড়ে সাতাশে পৌঁছেছি।

সাতাশ জন মানুষ।

নানা বয়সের। ধর্মের। মতের।

আগে কারো সঙ্গে আলাপ ছিল না। পরিচয় ছিল না। চেহারাও দেখিনি কোনো দিন।

কেউ ছাত্র ছিল। কেউ দিনমজুর। কৃষক। কিংবা মধ্যবিত্ত কেরানি। পাটের দালাল। অথবা পদ্মাপারের জেলে।

এখন সবাই সৈনিক।

একসঙ্গে থাকি। খাই। ঘুমোই।

রাইফেলগুলো কাঁধে তুলে নিয়ে যখন কোনো শত্রুর সন্ধানে বেরোই তখন মনে হয় পরস্পরকে যেন বহুদিন ধরে চিনি। জানি। অতি আপনজনের মতো অনুভব করি।

মনে হয় দীর্ঘদিনের আত্মীয়তার এক অবিচ্ছেদ্য বাঁধনে আবদ্ধ আমরা। আমাদের অস্তিত্ব ও লক্ষ্য দুই-ই এক। মাঝেমধ্যে বিশ্রামের মুহূর্তে গোল হয়ে বসে গল্প করি আমরা।

অতীতের গল্প।

বর্তমানের গল্প।

ভবিষ্যতের গল্প।

টুকিটাকি নানা আলোচনা।

ওষুধ ফুরিয়ে গেছে। আনতে হবে। কদিন ধরে শুধু ডাল-ভাত চলছে। একটু মাছ আর মাংস পেলে মন্দ হতো না। সাতাশ জন মানুষ আমরা। মাত্র নটা রাইফেল। আরো যদি অস্ত্র পেতাম। সবার হাতে যদি একটা করে রাইফেল থাকত, তাহলে সেদিন ওদের একজন সৈন্যও পালিয়ে যেতে দিতাম না।

মোট দুশো জনের মতো এসেছিল ওরা। ৪৫টা লাশ পেছনে ফেলে পালিয়েছে। তাড়া করেছিলাম আমরা। খেয়াপার পর্যন্ত। গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে ফিরে চলে এসেছি।

এসে দেখি আশপাশের গ্রাম থেকে অসংখ্য ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-গেরস্তবাড়ির বউ ছুটে এসেছে সেখানে।

কারো হাতে ঝাঁটা। দা। কুড়াল। খুন্তি।

মৃতদেহগুলোর মুখে ঝাঁটা মারছে ওরা।

ঘৃণা। ক্রোধ। যন্ত্রণা।

এত সব বুকে নিয়ে ওরা বাঁচবে কেমন করে। একটা বিস্ফোরণে যদি সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যেত তাহলে হয়তো বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে পারত ওরা।

ওরা একা নয়। অনেকগুলো মানুষ। সাড়ে সাত কোটি। এক কোটি লোক ঘর-বাড়ি-মাটি ছেড়ে পালিয়েছে, তিন কোটি লোক সারাক্ষণ পালাচ্ছে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে।

ভয়। ত্রাস। আতঙ্ক।

জ্ঞান ফিরে এলে আমিও পালিয়েছিলাম। পোড়ামাটির ঘ্রাণ নিতে নিতে। অনেক মৃতদেহ ডিঙিয়ে। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভেদ করে।

একটা গয়নার নৌকায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-বাচ্চাতে গিজগিজ করছিল সেটা। দুই পাশের গ্রামগুলোতে আগুন জ্বলছে।

কিছুক্ষণ আগে কয়েকটা প্লেন এসে একটানা বোমাবর্ষণ করেছে সেখানে।

কাছেই একটা মফস্বল শহর। এখনো পুড়ছে। কালো জমাট ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে আকাশের দিকে। একটা মানুষ নেই। কুকুর নেই। জন্তু-জানোয়ার নেই। শূন্য বাড়িগুলো প্রেতপুরীর মতো দাঁড়িয়ে।

মায়ের কথা মনে পড়তে বুকটা ব্যথা করে উঠল।

ছোটো ভাই। বোন ইতুদি। ওরা কেমন আছে?

বেঁচে আছে, না মরে গেছে?

জানি না। হয়তো বহুদিন জানব না।

তবু একটা কথা বারবার মনের মধ্যে উঁকি দেয় আমার।

আবার কি ওদের সঙ্গে একসঙ্গে নাস্তার টেবিলে বসতে পারব আমি?

আবার কি রোজ সকালে মা আমার বন্ধ দুয়ারে এসে কড়া নেড়ে ডাকবে? কিরে, এখনো ঘুমোচ্ছিস? অনেক বেলা হয়ে গেল যে।

ওঠ। চা খাবি না?

কিংবা।

দল বেঁধে সবাই বাড়ির ছাদের উপর কেরাম খেলা। পারব কি আবার?

সামনে তাকাই। বিরাট আকাশ। কয়েকটা লাউয়ের মাচা। কচি লাউ ঝুলছে। কয়েকটা ধানখেত। দুটো তালগাছ। দূরে আর একটা গ্রাম।

প্রতিদিন দেখি।

পেছনে কয়েকটা বাঁশবন। আড়ালে চার-পাঁচটা তাঁবু। একটা পুরনো দালান। সে দালানের গায়ে কাঠকয়লা দিয়ে অনেক ছোটো ছোটো রেখা এঁকেছি আমরা। ওগুলো মৃতের হিসাব।

আমাদের নয়।

ওদের।

যখনই কোনো শত্রুকে বধ করেছি, তখনই একটা নতুন রেখা টেনে দিয়েছি দেয়ালে। হিসাব রাখতে সুবিধে হয় তাই। প্রায়ই দেখি। গুনি। তিনশো বাহাত্তর, তিহাত্তর, চুয়াত্তর। পুরো দেয়ালটা কবে ভরে যাবে সে প্রতীক্ষায় আছি।

আমাদের যারা মরেছে। তাদের হিসাবও রাখি। কিন্তু সেটা মনে মনে। মনের মধ্যে অনেকগুলো দাগ। সেটাও মাঝে মাঝে গুনি।

একদিন।

বেশ কিছুদিন আগে। সেক্টর কমান্ডার এসেছিলেন আমাদের ক্যাম্পে, দেখতে। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। অভিবাদন করেছিলাম তাঁকে।

তিনি আমাদের একটি প্রশ্ন করেছিলেন।

প্রায় এক ধরনের উত্তর দিয়েছিলাম আমরা।

বলেছিলাম, দেশের জন্য। মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধ করছি। যুদ্ধ করছি দেশকে মুক্ত করার জন্য।

বাংলাদেশ।

না, পরে মনে হয়েছিল উত্তরটা বোধ হয় ঠিক হয়নি। নিজেরা অনেকক্ষণ আলাপ করেছি। উত্তরটা ঠিক হলো কি? দেশ তো হলো ভূগোলের ব্যাপার। হাজার বছরে যার হাজার বার সীমারেখা পাল্টায়। পাল্টেছে। ভবিষ্যতেও পাল্টাবে।

তাহলে কীসের জন্য লড়ছি আমরা?

বন্ধুরা নানা জনে নানা রকম উক্তি করেছিল।

কেউ বলেছিল, আমরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে লড়ছি। ওরা আমাদের মা-বোনদের কুকুর-বেড়ালের মতো মেরেছে, তাই। তার প্রতিশোধ নিতে চাই।

কেউ বলেছিল, আমরা আসলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছি। ওরা বহু অত্যাচার করেছে আমাদের ওপর। শোষণ করেছে। তাই ওদের তাড়ানোর জন্য লড়ছি।

কেউ বলেছিল, আমি অতশত বুঝি না মিয়ারা। আমি শেখ সাহেবের জন্য লড়ছি।

আমি ওদের কথাগুলো শুনছিলাম। ভাবছিলাম। মাঝেমধ্যে আলোচনায় অংশ নিতে গিয়ে তর্ক করছিলাম।

কিন্তু মন ভরছিল না।

কীসের জন্য লড়ছি আমরা? এত প্রাণ দিচ্ছি, এত রক্তক্ষয় করছি?

হয়তো সুখের জন্য। শান্তির জন্য। নিজের কামনা-বাসনাগুলোকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য।

কিংবা শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। অথবা সময়ের প্রয়োজনে। সময়ের প্রয়োজন মেটানোর জন্য লড়ছি আমরা।

অতশত ভাবতে পারি না। আমার ছোটো মাথায় অত ভাবনা এখন আর ধরে না। ব্যথা করে। যেটা বুঝি সেটা সোজা। আমাদের মাটি থেকে ওদের তাড়াতে হবে। এটাই এখনকার প্রয়োজন।

দেয়ালের রেখাগুলো বাড়ছে। মনের দাগও বাড়ছে প্রতিদিন।

হাতের কবজিতে এসে একটা গুলি লেগেছিল কাল। সেটা হাতে না লেগে বুকে লাগতে পারত। মাত্র দু আঙুলের ব্যবধান।

এখন কদিন বিশ্রাম।

মা কাছে থাকলে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। কাঁদত। বকুনি দিয়ে বলত, বাহাদুর। অত সামনে এগিয়ে গিয়েছিলি কেন? সবার পেছনে থাকতে পারলি না? আর অত বাহাদুরির দরকার নেই বাবা। ঘরের ছেলে এখন ঘরে ফিরে চল।

ঘর?

সত্যি, মানুষের কল্পনা বড়ো অদ্ভুত।

ঘরবাড়ি কবে ওরা পুড়ে ছাই করে দিয়েছে। তবু ঘরের কথা ভাবতে মন চায়।

খবর পেয়েছি মা, বাবা, ভাই, বোন ওরা সবাই কোথায় যেন চলে গেছে। হয়তো কোনো গ্রাম, কোনো গঞ্জে। কোনো উদ্বাস্তু শিবিরে। কিংবা—না। ওটা আমি ভাবতে চাই না।

জয়ার কোনো খবর নেই। কোথায় গেল মেয়েটা?

জানি না। জানতে গেলে ভয় হয়।

শুধু জানি, এ যুদ্ধে আমরা জিতব আজ, নয় কাল। নয়তো পরশু।

একদিন আমি আবার ফিরে যাব। আমার শহরে, আমার গ্রামে। তখন হয়তো পরিচিত অনেক মুখ সেখানে থাকবে না। তাদের আর দেখতে পাব না আমি। যাদের পাব তাদের প্রাণভরে ভালোবাসব।

যারা নেই কিন্তু একদিন ছিল, তাদের গল্প আমি শোনাব ওদের।

সেই ছেলেটির গল্প। বুকে মাইন বেঁধে যে ট্যাংকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

কিংবা সেই বুড়ো কৃষক। রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে যে মৃদু হেসে বলেছিল, চললাম। আর ফিরে আসেনি। অথবা উদ্বাস্তু শিবিরের পাঁচ লাখ মৃত শিশু।

দশ হাজার গ্রামের আনাচে কানাচে এক কোটি মৃতদেহ।

না এক কোটি নয়, হয়তো হিসাবের অঙ্ক তখন তিন কোটিতে গিয়ে পৌঁছেছে।

এক হাজার এক রাত কেটে যাবে হয়তো। আমার গল্প তবু ফুরাবে না।

সামনে ধানখেত। বিরাট আকাশ। একটা লাউয়ের মাচা, কচি লাউ ঝুলছে। দুটো তালগাছ। দূরে আরেকটা গ্রাম। গ্রামের নাম রোহনপুর। ওখানে এসে ঘাঁটি পেতেছে ওরা, একদিন যারা আমাদের অংশ ছিল।

ডায়েরিতে আর কিছু লেখা নেই।

খাতাটা ক্যাম্প-কমান্ডারের দিকে এগিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম, কার লেখা, আপনার?

না। আমাদের সঙ্গের একজন মুক্তিযোদ্ধার।

তাঁর সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারি কি? আবার প্রশ্ন করলাম।

উত্তর দিতে গিয়ে মুহূর্ত কয়েক আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, দিন কয়েক আগে একটা অপারেশনে গিয়ে ওদের হাতে ধরা পড়েছে সে।

তারপর?

তারপরের খবর ঠিক বলতে পারছি না। হয়তো মেরে ফেলেছে। বেঁচেও থাকতে পারে হয়তো।

চোখজোড়া অজান্তে আবার খাতাটার উপরে নেমে এলো। অনেকক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখলাম সেটা। তারপর মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম বাইরের দিকে।

বিরাট আকাশ। একটা লাউয়ের মাচা, কচি লাউ ঝুলছে। কয়েকটা ধানখেত। দুটো তালগাছ। দূরে আরেকটা গ্রাম। সেখানে আগুন জ্বলছে।

(সংক্ষেপিত)

## শব্দের অর্থ

**অপরিসর:** অপ্রশস্ত।

**উদ্বাস্তু:** বাসভূমি থেকে বিতাড়িত।

**ঊর্ধ্বশ্বাসে পালানো:** দ্রুত পলায়ন করা।

**কাতরোক্তি:** কাকুতি-মিনতি।

**ক্যাম্প-কমান্ডার:** ক্যাম্পের প্রধান।

**গয়নার নৌকা:** যাত্রীবাহী নৌকা বিশেষ।

**ঘাঁটি:** আস্তানা।

**ট্যাংক:** কামান-সজ্জিত সাঁজোয়া গাড়ি।

**প্রেতপুরী:** ভীতিকর জায়গা।

**বাহাদুর:** বীর।

**বিশ্রামাগার:** বিশ্রামের জায়গা।

**বিস্ফোরণ:** বিকট শব্দে ফেটে যাওয়া।

**শব্দের তাণ্ডব:** প্রচণ্ড শব্দ।

**হতবিহ্বল:** কী করতে হবে বুঝতে না পারা।

## ৬.২.৮ গল্পের গঠন বুঝি

'সময়ের প্রয়োজনে' গল্পটি ভালো করে পড়ো। তারপর নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। কাজটি প্রথমে নিজে করো এবং পরে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনে সংশোধন করো।

| | |
|---|---|
| কাহিনী কি নিয়ে? | মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাহিনি |
| কোন কোন চরিত্র আছে? | পাকিস্তানি সেনাদের হত্যাযজ্ঞ, বাঙালি কর্তৃক পাকিস্তানি শত্রু নিধন, গল্পে ডায়েরি লেখা এক মুক্তিযোদ্ধারা নিখোঁজ, দেশ স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করা। |
| কোন কোন চরিত্র আছে? | ক্যাম্প কমান্ডার, কথক, মুক্তিযোদ্ধ। |
| লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি কি? | ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানিদের অন্যায়ভাবে হত্যা ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের নির্মমতার প্রতিবাদ। |

## ৬.২.৯ জীবনের সাথে গল্পের সম্পর্ক খুঁজি

'সময়ের প্রয়োজনে' গল্পের আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১।'সময়ের প্রয়োজনে' গল্পে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কোন কোন দিক প্রতিফলিত হয়েছে?

উত্তর: একটি ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার গল্প নিয়ে রচিত 'সময়ের প্রয়োজনে' গল্প। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতা, নৃশংস গণহত্যা, রাজাকারদের ঘৃণ্য পাশবিক নির্যাতন ও মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ ইত্যাদি দেখানো হয়েছে এ গল্পে। বাঙালিরা জীবন বাজি রেখে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধে অনেকে শহিদ হয়েছেন অনেকেই আবার জয়ী হয়ে ফিরেছেন। বহু বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের সময় মা-বাবা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন হারিয়েছেন। বহু মানুষ অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। অনেক বাঙালিরা আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাঙালিদের জীবনের সমগ্র দিকই ফুটে উঠেছে এ গল্পে।

২। ‘দেয়ালের রেখাগুলো বাড়ছে। মনের দাগও বাড়ছে প্রতিদিন।’—কেন?

উত্তর: ‘সময়ের প্রয়োজনে’ গল্পে মুক্তিযুদ্ধকালীন এক মুক্তিযোদ্ধারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। গল্পের কথক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যতগুলো পশ্চিম পাকিস্তানিকে খতম করতে পারত দেয়ালে ততোগুলো রেখা টেনে রাখত হিসাব রাখার সুবিধার্থে। আর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা মারা যেত তাদেরও হিসাব রাখত। তবে সেটি দেয়ালে দাগ দিয়ে নয়; মনে মনে গুণে রাখত। প্রতিদিন পাকিস্তানিরা যেমন বাঙালিদের হাতে মারা যাচ্ছে তেমনি বাঙালিরাও পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে জীবন দিচ্ছে। তাই গল্পের কথক বলেছেন ‘দেয়ালের রেখাগুলো বাড়ছে। মনের দাগও বাড়ছে’ প্রতিদিন।

০৩. বইয়ে পড়া কিংবা কারো কাছে শোনা মুক্তিযুদ্ধের কোনো ঘটনা জানা থাকলে তা সংক্ষেপে লেখো।

উত্তর: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার দাদুর বয়স ছিল পনেরো বছর। দীর্ঘ নয় মাস পর নিরস্ত্র বাঙালিদের কাছে সুসজ্জিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে জন্ম হওয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ক্ষণটি তাঁর স্মৃতিতে এখনো উজ্জ্বল। মুক্তিযুদ্ধের সময় মিলিটারিরা আমাদের গ্রামের ব্রীজের পাশে বড়োসড়ো তাঁবু টানায় এবং বাঙ্কারও কাটে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য। দাদু দূর থেকে সব দেখতেন কিন্তু কাছে যেতে সাহস পেতেন না। কয়েকদিন পর তিনি দেখলেন গ্রামের রহমত মাতবর, আলিম ও রাজুসহ আরও কয়েকজন মিলিটারিদের ক্যাম্পে নিয়মিত যাতায়াত করছে। কেউ কেউ আবার চাল, আটা, মুরগি, ছাগলসহ প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করছে। দাদু তাঁর গ্রামের এক বড়োভাইয়ের কাছে জানতে পারেন যে, এরা শান্তিকমিটির সদস্য। ওরা এদেশের স্বাধীনতা চায় না। একথা শুনে তাদের প্রতি দাদুর প্রচণ্ড ঘৃণার উদ্রেগ হয়। দাদু তখন মনে মনে ভাবেন দেশের জন্য কিছু করতে হবে। তিনি ভাবেন গ্রামকে শত্রুমুক্ত করতে হলে মিলিটারিদের সঙ্গে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির আঁতাত করার কথাটি মুক্তিযোদ্ধাদের জানানো দরকার। তাই তিনি সংবাদটি মুক্তিযোদ্ধাদের জানান। ইতোমধ্যে রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানিরা বহু মানুষকে হত্যা করে বাড়িঘরে আগুন দেয়। মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় এবং তাঁরা পাল্টা আক্রমণ করে তাদের বাঙ্কার উড়িয়ে দেয়। যুদ্ধের শেষ পর্যায়। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল। দাদু সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখলেন হাতে লাল সবুজের পতাকা নিয়ে সবাই আনন্দ করছে। দাদুও সকলের সাথে মিছিলে যোগ দিয়ে সেদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্মক্ষণটির সাক্ষী হয়েছিলেন।

৩।

## ৬.২.১০ গল্প লিখি ও

তোমার অভিজ্ঞতা বা কল্পনা থেকে একটি বিষয় ঠিক করো। তারপর সেই বিষয়ক ঘটনা, কাহিনি ও চরিত্র দিয়ে একটি গল্প লেখো। অথবা, ৬.২.১-এ যে গল্প রচনা করেছিলে সেটি পরিমার্জন করো। লেখা শেষ হলে তোমার গল্পটি অন্যদের পড়তে দাও। তাদের আলোচনার ভিত্তিতে তোমার গল্প সংশোধন করতে পারো।

next page

গল্প লিখি

## অসময়ের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু

আমি আর রনি ছোটো থেকেই একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি। আমরা দিনের বেশিরভাগ সময়ই একসঙ্গে থাকতাম। একবার আমার শরীর খুব খারাপ হলো। প্রচন্ড জ্বরে আমি ঘুমের মধ্যে উলটাপালটা কথা বলতে লাগলাম। মাঝে মাঝেই জ্বরের ঘোরে রনির নাম বলতে থাকলাম। আমাদের বাড়ি থেকে রনির খোঁজও করা হলো, কিন্তু ওর দেখা পাওয়া গেল না। অনেকদিন শয্যাশয়ী ছিলাম, কিন্তু রনি একদিনও আমাকে দেখতে এলো না। আমার এসব ভেবে খুব কষ্ট হয়েছিল। একটু সুস্থ হতেই স্কুলে গেলাম। স্কুলে গিয়ে রনির সাথে দেখা হতেই সে হাসিমুখে কথা বলতে আসলো। কিন্তু আমি সাড়া দেইনি। নানা কথা ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। হঠাৎ চার-পাঁচটা ছেলে আমার পথ আগলে দাঁড়ায়। আমার কাছ থেকে টাকাপয়সা ও অন্য জিনিসপত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। তখনই রনি ছুটে এসে আমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচায়। ওকে আমার সঙ্গে এতোদিন দেখা না করার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে জানায় যে, তার দাদা মারা গিয়েছিল। তাই সে দাদাবাড়ি ছিল এতোদিন। একথা শুনে আমার ভুল ভাঙল। আমি তখন বুঝতে পারলাম। প্রকৃত বন্ধু কখনো বিপদে চুপ করে থাকে না।

## ৩য় পরিচ্ছেদ

# প্রবন্ধ

## ৬.৩.১ প্রবন্ধ লিখি

ইতোমধ্যে প্রবন্ধ সম্পর্কে তোমরা কিছু ধারণা পেয়েছ। সেই ধারণার ভিত্তিতে কোনো বিষয় ঠিক করে তার উপরে একটি প্রবন্ধ রচনা করো। তোমার প্রবন্ধের শিরোনাম হতে পারে—(ক) যানবাহন, (খ) একটি দুর্যোগময় রাত, (গ) গ্রামের খেলাধুলা, (ঘ) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, (ঙ) আমার শখ ইত্যাদি।

লেখা হয়ে গেলে তোমার প্রবন্ধ থেকে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো শনাক্ত করো—

- বিষয়টি ব্যক্তিজীবন বা পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত কি না?
- একাধিক অনুচ্ছেদে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে কি না?
- রচনাটিতে কী কী তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে?
- রচনাটি বিবরণমূলক না বিশ্লেষণমূলক?
- এখানে তোমার নিজের মত তুলে ধরতে পেরেছ কি না?
- রচনাটিতে কোনো ভূমিকা ও উপসংহার আছে কি না?
- রচনাটির মধ্যে কোনো অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা রয়ে গেল কি না?

## প্রবন্ধ কী

প্রবন্ধ হলো গদ্যভাষায় রচিত এক ধরনের সুবিন্যস্ত রচনা। প্রবন্ধের মধ্যে তথ্য থাকে, তথ্যের বিবরণ থাকে এবং তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশ বা ভাগ থাকে। প্রথম অংশ ভূমিকা; এতে মূল আলোচনার ইঙ্গিত থাকে। এরপর একাধিক অনুচ্ছেদে উপাত্ত ও তথ্যের বিবরণ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাবন্ধিক নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। প্রবন্ধের সবশেষ অংশ উপসংহার; এতে প্রাবন্ধিকের সমাপ্তিসূচক মন্তব্য থাকে। প্রবন্ধ চিন্তাশীল রচনা বলে এতে আবেগের চেয়ে যুক্তির প্রাধান্য বেশি।

ধরন অনুযায়ী প্রবন্ধ কয়েক রকম হতে পারে; যেমন—বিবরণমূলক, বিশ্লেষণমূলক, কল্পনামূলক ইত্যাদি। বিষয়ের দিক থেকেও প্রবন্ধ নানা রকম হয়ে থাকে; যেমন—সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ, সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ ইত্যাদি।

প্রবন্ধের ভাষা হতে হয় সরল ও স্পষ্ট। লেখার সময়ে বাক্যগুলো এমন হতে হয় যাতে একটি বাক্য পরের বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে। এমনকি, একটি অনুচ্ছেদ থেকে আরেকটি অনুচ্ছেদে যাওয়ার সময়েও সেই সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়।

প্রবন্ধে লেখকের নিজের একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। অভিজ্ঞতা ও পঠনপাঠন এই দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে।

## প্রবন্ধ পড়ি

নিচের লেখাটি মোতাহের হোসেন চৌধুরীর (১৯০৩-১৯৫৬) একটি প্রবন্ধ। তিনি বাংলাদেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক। তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধের বইয়ের নাম 'সংস্কৃতি কথা'। নিচের প্রবন্ধটি লেখকের 'সংস্কৃতি-কথা' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

# লাইব্রেরি

### মোতাহের হোসেন চৌধুরী

পুস্তকের শ্রেণিবদ্ধ সংগ্রহকে লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার বলা হয়। সকল প্রকার জ্ঞানকে একত্র করে স্থায়িত্ব দানের অভিপ্রায় থেকে লাইব্রেরির সৃষ্টি। এক ব্যক্তির পক্ষে সর্ববিদ্যাবিশারদ হওয়া অসম্ভব। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে। আবার যে ব্যক্তি যে বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে, তার সবটুকু জ্ঞান মস্তিষ্কে ধারণ করাও তার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই প্রয়োজন এমন কোনো উপায় উদ্ভাবনের, যার দৌলতে দরকার অনুযায়ী সমস্ত বিষয়ে একটা মোটামুটি জ্ঞান লাভ করা যায়। ফলে লাইব্রেরির সৃষ্টি।

লাইব্রেরি তিন প্রকার—ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সাধারণ।

ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ব্যক্তিমনের খেয়ালমতো গড়ে ওঠে—তা হয়ে থাকে ব্যক্তির মনের প্রতিবিম্ব। ব্যক্তি যে ধরনের রচনা ভালোবাসে তার প্রাচুর্য, আর যে ধরনের রচনা পছন্দ করে না তার অনুপস্থিতি হয়ে থাকে ব্যক্তিগত লাইব্রেরির বৈশিষ্ট্য। এখানে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী সম্রাট, খেয়ালমতো গড়ে তোলে তার কল্পনার তাজমহল। কাব্যপ্রেমিক হলে কাব্যগ্রন্থ দিয়ে, কথাসাহিত্য-প্রেমিক হলে কথাসাহিত্য দিয়ে, ইতিহাসপ্রিয় হলে ঐতিহাসিক গ্রন্থ দিয়ে সে সাজিয়ে তোলে তার টেবিল, আলমারির শেলফ—সব কিছু। কারো বাধা দেওয়ার অধিকার নেই, আপত্তি করবার দাবি নেই, উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। এখানে সে স্বাধীন, স্বতন্ত্র।

ব্যক্তিগত লাইব্রেরি যেমন ব্যক্তির ইচ্ছার প্রতিবিম্ব, পারিবারিক লাইব্রেরি তেমনি পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিসমূহের সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রতিচ্ছায়া। এখানে যেমন একের রুচির ওপর বহুর অত্যাচার অশোভন, তেমনি বহুর রুচির উপর একের জবরদস্তি অন্যায়। দশ জনের রুচির দিকে নজর রেখেই পারিবারিক লাইব্রেরি সাজাতে হয়।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক লাইব্রেরি ব্যক্তি বা পরিবারের মর্জিমাফিক গড়ে ওঠে। সাধারণের হুকুম চালাবার মতো সেখানে কিছুই নেই। লাইব্রেরি-সম্পন্ন ব্যক্তির চালচলনে এমন একটা শ্রী ফুটে উঠতে বাধ্য, যা অন্যত্র প্রত্যক্ষ করা দুষ্কর। সত্যিকার বৈদগ্ধ্য বা চিৎপ্রকর্ষের অধিকারী হতে হলে লাইব্রেরির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। তাছাড়া, লাইব্রেরি বা শ্রেণিবদ্ধ পুস্তক-সংগ্রহ গৃহসজ্জার কাজেও লাগে। আর এই ধরনের গৃহসজ্জায় লাভ এই যে, বাইরের পারিপাট্যের সঙ্গে তা মানসিক সৌন্দর্যেরও পরিচয় দেয়। লাইব্রেরি সৃজনে তৎপর হয়ে ধনী ব্যক্তিরা পুস্তক কেনার নেশা সৃষ্টি করলে দেশের পক্ষে লাভ হবে এই যে—অনবরত বাঁধানো পুস্তকগুলো হাতড়াতে হাতড়াতে তাদের চামড়ার তলে যে একটি মন সুপ্ত রয়েছে, সে সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন হয়ে উঠবেন। লাইব্রেরি সৃজনের দরুন তাঁরা নিজেরা ততটা লাভবান না হলেও তাঁদের পুত্রকন্যাদের যথেষ্ট উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা। হয়তো এই লাইব্রেরি থাকার দরুনই পরিণত বয়সে তাঁরা সুসাহিত্যিক বা সাহিত্য-সমঝদার হয়ে উঠবেন। এ আশা শুধু ভিত্তিহীন কল্পনা নয়, বড়ো বড়ো সাহিত্যিক বা কবিদের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায়, বাল্যে তাঁরা পিতার অথবা পারিবারিক লাইব্রেরি থেকে সাহিত্যসাধনার প্রেরণা লাভ করেছেন।

সাধারণ পাঠাগার আধুনিক জিনিস। কারণ, ঐতিহাসিকরা কী বলবেন জানি না, যে জ্ঞানার্জন স্পৃহা থেকে পাঠাগারের জন্ম, ব্যাপকভাবে তার জাগরণ-স্পৃহা সহজে মেটানো সম্ভব নয়। জ্ঞানের বাহন পুস্তক, আর পুস্তক কিনে পড়া যে দুঃসাধ্য ব্যাপার, তা ধারণা করা সহজ। পুস্তকের ব্যাপারেও সমবায়নীতির প্রবর্তন আবশ্যক। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও দশে মিলে কাজ না করলে সার্থকতা লাভ করা অসম্ভব। এ ব্যাপারে দশের মিলিত ফলস্বরূপ যা পাওয়া যায়, তাকেই সাধারণ লাইব্রেরি বলা হয়। অবশ্য সাধারণ লাইব্রেরি ব্যক্তির দানও হতে পারে। তবে ব্যক্তিগত প্রভাবের চাইতে সাধারণের প্রভাবই সেখানে বলবত্তর হতে বাধ্য। যদি না হয়, তবে সাধারণ পাঠাগার না বলে ব্যক্তিগত পাঠাগার বলাই ভালো।

সাধারণ লাইব্রেরির পুস্তক শ্রেণিবদ্ধ করতে যথেষ্ট সতর্কতার পরিচয় দিতে হলেও পুস্তক নির্বাচনে বিশেষ সাবধানতার পরিচয় দিতে হয় বলে মনে হয় না। সাধারণ লাইব্রেরির পুস্তক সংগ্রহ বিষয়ে আরেকটি কথা বলা দরকার। পুস্তক নির্বাচনকালে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বা জাতীয় সংকীর্ণতার পরিচয় যত কম দেওয়া হয়, ততই ভালো। কারণ, যতদূর মনে হয়, পাঠাগার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের রক্ষক নয়, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশক। আর ভালো পুস্তক লেখক যখন কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক নন, সমস্ত সম্প্রদায়ের আত্মীয়, তখন পুস্তক নির্বাচনকালে সংকীর্ণ মনোভাব-সম্পন্ন না হওয়াই ভালো।

জাতির জীবনধারা গঙ্গা-যমুনার মতো দুই ধারায় প্রবাহিত। এক ধারার নাম আত্মরক্ষা বা স্বার্থ প্রসার, আরেক ধারার নাম আত্মপ্রকাশ বা পরার্থ বৃদ্ধি। একদিকে যুদ্ধবিগ্রহ মামলা-ফ্যাসাদ প্রভৃতি কদর্য দিক, অপর দিকে সাহিত্য শিল্প ধর্ম প্রভৃতি কল্যাণপ্রদ দিক। একদিকে শুধু কাজের জন্য কাজ, অপর দিকে আনন্দের জন্য কাজ। একদিকে সংগ্রহ, আরেক দিকে সৃষ্টি। যে জাতি দ্বিতীয় দিকটির প্রতি উদাসীন থেকে শুধু প্রথম দিকটির সাধনা করে, সে জাতি কখনো উঁচু জীবনের অধিকারী হতে পারে না। কোনো প্রকারে টিকে থাকতে পারলেও নব নব বৈভব সৃষ্টি তার দ্বারা সম্ভব হয় না। মানসিক ও আত্মিক জীবনের সাধনা থেকে চরিত্রে যে শ্রী ফুটে ওঠে, তা থেকে তাকে এক রকম বঞ্চিত থাকতেই হয়। জীবনে শ্রী ফোটাতে হলে দ্বিতীয় দিকটির সাধনা আবশ্যক। আর সেজন্য লাইব্রেরি এক অমূল্য অবদান।

লাইব্রেরি জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মানদণ্ড কারণ, বুদ্ধির জাগরণ-ভিন্ন জাতীয় আন্দোলন হুজুগপ্রিয়তা ও ভাববিলাসিতার নামান্তর, আর পুস্তক অধ্যয়ন ব্যতীত বুদ্ধির জাগরণ অসম্ভব।

(সংক্ষেপিত)

## শব্দের অর্থ

**অভিপ্রায়:** ইচ্ছা।

**উদ্ভাবন:** নতুন কিছু তৈরি করা।

**কাব্যপ্রেমিক:** যে কবিতা ভালোবাসে।

**চিৎপ্রকর্ষ:** জ্ঞানচর্চার ফলে মনের উন্নতি।

**জবরদস্তি:** জুলুম।

**দুষ্কর:** সহজে করা যায় না এমন।

**পরার্থ:** পরের উপকার।

**পারদর্শিতা:** পটুতা।

**পারিপাট্য:** গোছানো ভাব।

**প্রতিচ্ছায়া:** প্রতিফলন।

**প্রতিবিম্ব:** প্রতিচ্ছবি।

**প্রবর্তন:** প্রচলন।

**বলবত্তর:** অধিক বলশালী।

**বিকাশক:** যা বিকাশ ঘটায়।

**বৈদগ্ধ্য:** পাণ্ডিত্য।

**বৈভব:** ঐশ্বর্য

**ভাববিলাসিতা:** কল্পনাবিলাস।

**মর্জিমাফিক:** খেয়াল অনুসারে।

**শ্রী:** সৌন্দর্য।

**শ্রেণিবদ্ধ:** সারিতে সাজানো।

**সমঝদার:** ভালো বোঝে এমন।

**সমবায়:** বহু মানুষের মিলিত উদ্যোগ।

**সম্প্রদায়:** গোষ্ঠী।

**সর্ববিদ্যাবিশারদ:** সব বিষয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকারী।

**সৃজন:** সৃষ্টি।

**স্পৃহা:** ইচ্ছা; আকাঙ্ক্ষা।

**স্বেচ্ছাচারী:** যে অন্যের মতকে তোয়াক্কা করে না।

## ৬.৩.২ প্রবন্ধের গঠন বুঝি

‘লাইব্রেরি’ প্রবন্ধটি থেকে নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করো এবং তোমার মতামত লেখো। লেখা শেষ হয়ে গেলে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

| | |
|---|---|
| বিষয়বস্তু | |
| তথ্য-উপাত্ত | |
| প্রবন্ধের ধরন | |
| ভাষা | |
| দৃষ্টিভঙ্গি | |

## ৬.৩.৩ জীবনের সঙ্গে প্রবন্ধের সম্পর্ক খুঁজি

‘লাইব্রেরি’ প্রবন্ধের আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১। ‘লাইব্রেরি’ প্রবন্ধে লেখক যে তিন ধরনের লাইব্রেরির কথা বলেছেন, সেগুলোর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

২। লেখকের মতে লাইব্রেরির প্রয়োজন কেন?

৩। তুমি একটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরি তৈরি করতে চাইলে সেখানে কী কী ধরনের বই রাখবে?

## ৬.৩.৪ প্রবন্ধ লিখি ও যাচাই করি

তুমি একটি বিষয় ঠিক করো। তারপর সেই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখো। অথবা, ৬.৩.১-এ যে প্রবন্ধ রচনা করেছিলে সেটি পরিমার্জন করো। লেখা শেষ হলে তোমার প্রবন্ধটি অন্যদের পড়তে দাও। তাদের আলোচনার ভিত্তিতে তোমার প্রবন্ধ সংশোধন করতে পারো।

## ৪র্থ পরিচ্ছেদ

# নাটক

## ৬.৪.১ নাটক রচনা করি

পূর্ববর্তী শ্রেণিগুলোতে তোমরা নাটক সম্পর্কে ধারণা পেয়েছ। কোনো একটি বিষয়কে অবলম্বন করে কাহিনি, চরিত্র ও সংলাপের মাধ্যমে কীভাবে একটি নাটক তৈরি হয়, সে সম্পর্কে জেনেছ। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে এখন তুমি ২৫০-৩০০ শব্দের মধ্যে একটি নাটক লেখো। নাটকটি বাস্তব কোনো ঘটনার উপর ভিত্তি করে রচিত হতে পারে, আবার কোনো কাল্পনিক ঘটনার উপর ভিত্তি করেও রচিত হতে পারে। নাটক রচনা হয়ে গেলে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সামনে উপস্থাপন করো।

তোমার লেখা নাটকে নিচের বিষয়গুলো আছে কি না যাচাই করে দেখো—

- কাহিনি আছে কি না?
- চরিত্র আছে কি না?
- সংলাপ আছে কি না?

## নাটক কী

নাটক সংলাপ-নির্ভর রচনা। নাটকে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে কাহিনি সাজানো হয় এবং সেই কাহিনি ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। নাটকের ঘটনাগুলো এক বা একাধিক দৃশ্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। ঘটনা ফুটিয়ে তুলতে চরিত্রের প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় সংলাপের। নাটক মূলত অভিনয়ের জন্য রচনা করা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নাটক রচিত হয়। বিষয় অনুযায়ী নাটক অনেক রকমের হতে পারে; যেমন—সামাজিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, রাজনৈতিক নাটক ইত্যাদি। আবার নাটকের পরিণতি অনুযায়ী নাটককে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেসব নাটকের শেষ হয় দুঃখের মধ্য দিয়ে, সেগুলোকে বলে ট্র্যাজেডি। আর যেসব নাটকের শেষ হয় আনন্দের মধ্য দিয়ে, সেগুলোকে বলে কমেডি।

যিনি নাটক রচনা করেন তাঁকে নাট্যকার বলে। যাঁরা নাটকে অভিনয় করেন, তাঁদের বলে অভিনেতা। যিনি নাটক পরিচালনা করেন বা নির্দেশনা দেন, তাঁকে বলে পরিচালক বা নির্দেশক। নাটকে মঞ্চ সাজানো, অভিনেতাদের সাজসজ্জা, আলোক প্রক্ষেপণ, শব্দ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজের জন্যও ভিন্ন ভিন্ন লোক দায়িত্ব পালন করেন।

কোনো নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার আগে কয়েকবার অনুশীলনের দরকার হয়। এই অনুশীলনের নাম মহড়া।

## নাটক পড়ি

ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮) 'প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ' নামে পরিচিত। ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, নাটক, ভ্রমণকাহিনি ইত্যাদি রচনায় তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার পাশা' 'ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র' ইত্যাদি।

# মানসিংহ ও ঈসা খাঁ

### ইব্রাহীম খাঁ

## চরিত্র

মানসিংহ

দুর্জয়সিংহ

দূত

ঈসা খাঁ

## এক

[স্থান: এগারোসিন্ধুর। মহারাজ মানসিংহের শিবির।]

মানসিংহ : শোনা যায়, একদা এক অসুররাজ গোষ্পদে ডুবে মরেছিল। একথা বিশ্বাস করো, দুর্জয়সিংহ?

দুর্জয়সিংহ : এ পুরাণের কাহিনিমাত্র। বিশ্বাস করি না!

মানসিংহ : আমিও আগে বিশ্বাস করতাম না, দুর্জয়সিংহ, কিন্তু এখন বিশ্বাস করি।

দুর্জয়সিংহ : সত্যি বিশ্বাস করেন, মহারাজ?

মানসিংহ` : চোখের সামনে যা ঘটে গেল, দুর্জয়সিংহ, তাতে বিশ্বাস না করি কেমনে, তাই বলো। নইলে বাংলার এক অজ্ঞাতনামা ক্ষুদ্র পাঠানসর্দার ঈসা খাঁ, তাঁরই তলোয়ারতলে মারা যায় ক্ষত্র-বীর মানসিংহের আপন জামাতা?

দুর্জয়সিংহ : আশ্চর্যই বটে!

মানসিংহ : মানুষ হয়ে জন্মেছিল, একদিন তো সে মরতই—না হয় দুদিন আগে মরেছে। কিন্তু রাজপুতনার মরুসিংহ মারা গেল বাংলার বকরির হাতে—এ দুঃখ রাখবার স্থান কোথায়, দুর্জয়সিংহ?

দুর্জয়সিংহ : মহারাজ, এ দুঃখ করতে পারেন।

মানসিংহ : জামাতা নিহত হয়েছে, কিন্তু তারও চেয়ে বড়ো দুঃখ যে, এই কাহিনি শুনে রাজপুতনার নারীরা হাসবে, শত্রুরা উপহাস করে রটনা করবে, আমি নিজে ভয় পেয়ে ঈসা খাঁর সামনে আমার জামাতাকে পাঠিয়েছিলাম। অনেকে ভাববে, আমরা কাপুরুষ।

দুর্জয়সিংহ : এ বিধাতার বিধান, মহারাজ, সয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কী?

মানসিংহ : না। আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করব—আমি ঈসা খাঁকে হত্যা করব।

দুর্জয়সিংহ : কিন্তু সে কী করে সম্ভব হবে?

মানসিংহ : ঈসা খাঁ আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিল, পাঠিয়েছিলাম আমার জামাতাকে। আমার জামাতাকে হত্যা করে ভেবেছে, সে বুঝি মানসিংহকেই হত্যা করেছে। আমি তাকে জানিয়েছি, ঈসা খাঁর মুণ্ডপাত করার জন্য মানসিংহ এখনও জীবিত রয়েছেন। এবার দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান গিয়েছে আমার তরফ থেকেই।

দুর্জয়সিংহ : কোনো উত্তর পেয়েছেন?

মানসিংহ : না, তবে এক্ষুনি পাব। জানি না; সে কাপুরুষ পুনরায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাজি হবে কি না।

[দূতের প্রবেশ।]

দূত : (কুর্নিশ করে) মহারাজের জয় হোক!

মানসিংহ : কী সংবাদ, দূত?

দূত : সংবাদ শুভ। মহারাজকে হত্যা করেছে ভেবে তারা উৎসব করছিল; এমন সময়ে আপনার আহ্বান নিয়ে আমি হাজির! তবে ঈসা খাঁ এ আহ্বান গ্রহণ করেছেন।

মানসিংহ : গ্রহণ করেছেন? অনেকক্ষণ পরে নিশ্চয়ই?

দূত : না মহারাজ! তক্ষুনি গ্রহণ করেছেন।

মানসিংহ : তক্ষুনি? আচ্ছা, তা বেশ। কোনো জবাব এনেছ?

দূত : এনেছি, মহারাজ! তবে দেখাতে সাহস হয় না।

মানসিংহ : তোমাকে অভয় দিচ্ছি, দূত।

দূত : মহারাজ, ঈশা খাঁ লোকটা, নিতান্ত ... নিতান্ত ... এই নিতান্ত ...

মানসিংহ : নিতান্ত কী?

দূত : আজ্ঞে, নিতান্ত গোঁয়ার। কারণ মহারাজের আহ্বানপত্র পেয়েই অমনি তলোয়ার খুললেন, তারপর নিজের হাত কেটে তারই রক্তে তলোয়ারের ডগা দিয়ে উত্তর লিখলেন—'বহুত আচ্ছা'।

## দুই

[স্থান: লড়াইয়ের ময়দান। একদিকে পাঠান শিবির, অন্যদিকে মোগল শিবির। অদূরে এগারোসিন্ধুর কেল্লা। ময়দানের মাঝখানে ঈসা খাঁ ও মানসিংহ সামনাসামনি দাঁড়িয়ে।]

ঈসা খাঁ : নমস্কার, মহারাজ।

মানসিংহ : আদাব, খাঁ সাহেব।

ঈসা খাঁ : এত তকলিফ করে এখানে না এসে মহারাজ যদি আদেশ করতেন, তবে দিল্লিতে গিয়েই মহারাজের সঙ্গে আমি একহাত লড়ে আসতাম।

মানসিংহ : বাংলার ঝোপে-জঙ্গলে আপনারা কেমন আছেন, একটু দেখতে শখ হলো, খাঁ সাহেব।

ঈসা খাঁ : রাজপুতনার মরু-পর্বতের কোন অন্ধকার গুহায় মহারাজ কীরূপে থাকেন, তা দেখবার কৌতূহলও তো এ বান্দার হতে পারত!

মানসিংহ : পাঠানেরা দেখছি ইদানীং কথা বলতে শিখেছে।

ঈসা খাঁ : এ আপনাদের মতো কথাসর্বস্বদের সঙ্গে থাকার ফল। আগে পাঠানেরা কথা বলত না; কথা বলত কেবল তাদের তির আর তলোয়ার।

মানসিংহ : ইদানীং বুঝি তাহলে পাঠানদের তির-তলোয়ার ভোঁতা হয়ে পড়েছে!

ঈসা খাঁ : শাহি ফৌজের ওপর ক্রমাগত ব্যবহারে একটু ভোঁতা হয়েছে বৈকি!

মানসিংহ : তাহলে এখন তলোয়ার ছেড়ে কাবুলি মেওয়ার কারবার শুরু করলে হয় না, খাঁ সাহেব?

ঈসা খাঁ : কিন্তু কাবুলি মেওয়া এখানে খাবে কে? মহারাজের তো বাজরার খিচুড়ি আর ঘাসের রুটি খেয়ে খেয়ে পেট এমনি হয়েছে যে, কাবুলি আঙুরের গন্ধেই বমি আসে।

মানসিংহ : কিন্তু খাঁ সাহেব কি কেবল কথার যুদ্ধের জন্যই তৈরি হয়ে এসেছেন, না আরও কোনো মতলব আছে?

ঈসা খাঁ : সে সম্পূর্ণ মহারাজের অভিরুচি। ঈসা খাঁ যে কোনো সময়ে যে কোনো স্থানে যে কোনো অস্ত্রে যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত।

মানসিংহ : মনে হচ্ছে, শাহবাজ খাঁকে পরাজিত করে ঈসা খাঁর অহংকার বেড়েছে। কিন্তু ঈসা খাঁ কেবল ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেননি।

ঈসা খাঁ : কিন্তু ফাঁদের সঙ্গে যে এ বান্দার কিঞ্চিৎ পরিচয় ঘটেছে—এই মাত্র সেদিন—সে তো মহারাজের অজানা থাকবার কথা নয়।

মানসিংহ : সে কথা জানি, কাপুরুষ। আমার জামাতা—এক অনভিজ্ঞ তরুণ যুবক—বাগে পেয়ে তাকে তুমি হত্যা করেছ।

ঈসা খাঁ : খবরদার মানসিংহ। ঈসা খাঁকে 'কাপুরুষ' বলে কেউ কোনোদিন রেহাই পায়নি। আর ঈসা খাঁ নিজে পর্দার আড়ালে থেকে জামাতাকে কখনও লড়াইয়ে পাঠায়নি। কিন্তু আজ তোমাকে ক্ষমা করছি—সেই মহান যুবকের নামে, যিনি বীরের মতো যুদ্ধ করে সমর শয্যা গ্রহণ করেছেন।

মানসিংহ : ভূতের মুখে রাম নাম! কিন্তু আত্মরক্ষা করো, ঈসা খাঁ।

ঈসা খাঁ : তুমিও আত্মরক্ষা করো মানসিংহ।

[যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধ করতে করতে ঈসা খাঁর তলোয়ারের আঘাতে মানসিংহের তলোয়ার ভেঙে পড়ে গেল। নিরস্ত্র মানসিংহ ভীতভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।]

ঈসা খাঁ : এখন মহারাজকে রক্ষা করবে কে?

মানসিংহ : কেউ না; তুমি আমাকে হত্যা করো, ঈসা খাঁ।

ঈসা খাঁ : না, মহারাজ, সে হয় না। নিরস্ত্রের ওপর ঈসা খাঁ ওয়ার করে না।

মানসিংহ : তবে আমাকে বন্দি করো, আমি তোমার অনুগ্রহ চাই না।

ঈসা খাঁ : তাও হয় না মহারাজ। আপনার মতো সাহসী যোদ্ধাকে বাগে পেয়ে আমি বন্দি করব না। এই নিন আমার তলোয়ার—যুদ্ধ করুন।

[নিজ তলোয়ার মানসিংহের হাতে তুলে দিয়ে বাম কটি থেকে অন্য তলোয়ার খুলে দাঁড়ালেন।]

মানসিংহ : (একটু ভেবে তলোয়ার ছুড়ে ফেলে দিলেন) আমি লড়ব না।

ঈসা খাঁ : কেন, মহারাজ?

মানসিংহ : আপনার সঙ্গে আমার যুদ্ধ নেই।

ঈসা খাঁ : বটে।

মানসিংহ : ঈসা খাঁ, চমৎকার। দূর হতে তোমার কত নিন্দাই শুনেছি, ভাই কাছে এসেও এতদিন তোমাকে চিনতে পারিনি। আজ তোমার সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় হলো, এই-ই আমার পরম লাভ! তোমাকে চিনবার আগে মরলে মানসিংহের জীবনে একটা মস্ত ফাঁক থেকে যেত।

ঈসা খাঁ : মহারাজ—ভাই—তোমার হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে আমিও ধন্য।

মানসিংহ : তবে, এসো ভাই! (আলিঙ্গান করে) আমাদের এই আলিঙ্গানের ভিতর দিয়ে মোগল-পাঠানের বন্ধুত্ব হোক, ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মিলন হোক আর কখনো আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির পবিত্র বক্ষ কলঙ্কিত করব না।

## শব্দার্থ ও টীকা

**অসুররাজ:** অসুরদের রাজা।

**আহ্বানপত্র:** আমন্ত্রণপত্র।

**ঈসা খাঁ:** ষোলো শতকের বাংলা অঞ্চলের একজন রাজা।

**এগারোসিন্ধুর:** কিশোরগঞ্জের একটি জায়গার নাম।

**ওয়ার:** আঘাত।

**কথাসর্বস্ব:** কাজের থেকে যার কথার জোর বেশি।

**কুর্নিশ:** মাথা নত করা।

**ক্ষত্র-বীর:** ক্ষত্রিয় বীর।

**গোষ্পদ:** গোরুর খুরের চাপে তৈরি গর্ত।

**ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখোনি:** বিপদের ভয় দেখানো।

**ডগা:** অগ্রভাগ।

**তকলিফ:** কষ্ট।

**বকরি:** ছাগল।

**বহুত আচ্ছা:** খুব ভালো।

**বাজরা:** শস্য বিশেষ।

**মানসিংহ:** মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি।

**মেওয়া:** ফল।

**রাজপুতনা:** রাজস্থান; ভারতের একটি প্রদেশ।

## ৬.৪.২ নাটকের গঠন বুঝি

‘মানসিংহ ও ঈসা খাঁ’ নাটকের কাহিনি কোন বিষয়কে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, নাটকের চরিত্রগুলোর কার কী ভূমিকা, প্রধান দুই চরিত্রের সংলাপের মধ্যে মিল কোথায়, দৃশ্যগুলো কোন কোন স্থানের এবং নাটকে নাট্যকারের কোন মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে, তা নিচের ছকে লেখো। লেখা হয়ে গেলে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

| | |
|---|---|
| কাহিনি | |
| চরিত্র | |
| সংলাপ | |
| দৃশ্য | |
| নাট্যকারের মনোভাব | |

## ৬.৪.৩ জীবনের সাথে নাটকের সম্পর্ক খুঁজি

'মানসিংহ ও ঈসা খাঁ' নাটকের আলোকে নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো এবং পরে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে নিজের উত্তর সংশোধন করো।

১। 'মানসিংহ ও ঈসা খাঁ' নাটকের কাহিনি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লেখো।

২। নাটকটির যে কোনো একটি চরিত্র সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

৩। 'মানসিংহ ও ঈসা খাঁ' নাটকে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ কীভাবে আমাদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব রাখে?

## ৬.৪.৪ নাটক করি

'মানসিংহ ও ঈসা খাঁ' নাটকটি অভিনয়ের প্রস্তুতি নাও এবং মহড়া দাও। বিদ্যালয়ের কোনো বিশেষ দিনে কিংবা তোমাদের সুবিধামতো সময়ে নাটকটি মঞ্চস্থ করো।